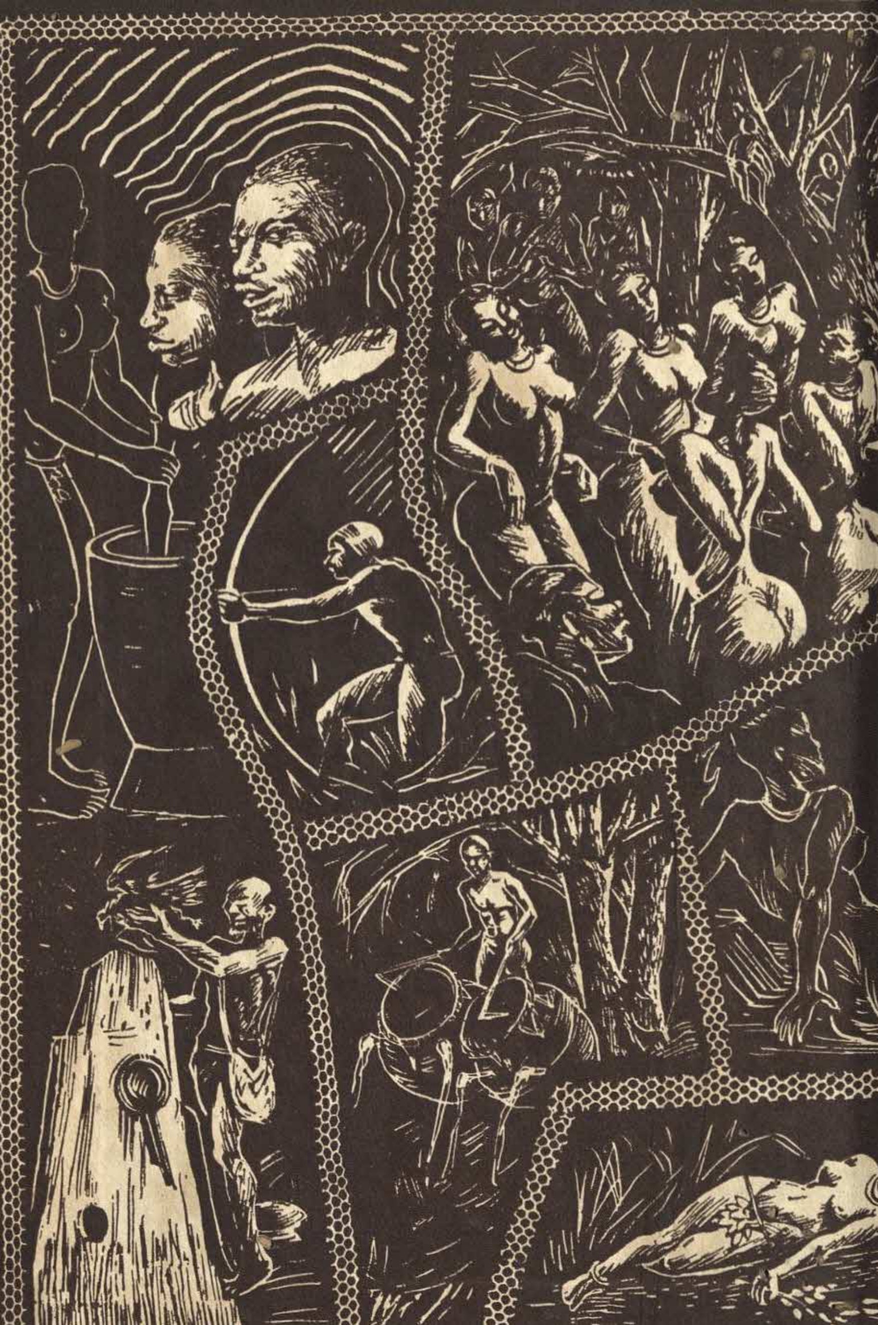
বাইগিনী কন্যা







বাঘিনী কন্যা

আর. এস. র‍্যাটরে

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
রাখাল ভট্টাচার্য
অনূদিত -

ইষ্টলাইট বুক হাউস

প্রথম সংস্করণ : জাতীয় দিবস ১৩৬১

প্রকাশক : বাসুদেব লাহিড়ী
ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, স্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা—১

মুদ্রক : নারায়ণ লাহিড়ী
লয়াল আর্ট প্রেস, লিঃ
কলিকাতা—১

প্রচ্ছদভূষণ : সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : তুই টাকা বারো আনা

উৎসর্গ

গায়ক, খেলোয়াড় ও মনীষী

পল্ রোব্‌সন্-কে,

যিনি আফ্রিকাকে তাঁর মাতৃভূমি বলে দাবি করতে গৌরব বোধ করেন,

আফ্রিকাও যার মাতৃত্বে গৌরবান্বিত এবং

যে সন্তানকে স্বাগত জানাতে চির-উন্মুখ॥

কোন কোন অঞ্চলে আবার দেশী-বিদেশী মিশ্রণে নতুন জাতিরও উৎপত্তি হয়েছে।

আফ্রিকায় আদিম অধিবাসী নিগ্রোদের সংখ্যা আজও ক্রমবর্ধমান। আর বিদেশীয়দের মধ্যে আভ্যন্তরীন অঞ্চলে যারা বাস করছে, তাদের সংখ্যা নগণ্য।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ক্রমশ যতই প্রবল হয়ে ওঠে, সেই বর্ণবৈষম্যের সংঘর্ষে কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের সঙ্গে ক্রমেই সমভাব জেগে ওঠে মুষ্টিমেয় সচেতন নিগ্রোদের মনে।

নিগ্রোজাতি হিসেবে এ যুগে সর্বাগ্রে বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণ করে সুদানীরা। বিগত শতকের শেষভাগে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কিচেনার কর্তৃক বিজিত হয়ে তারা ইংরেজ অভিভাবকত্বে চালিত মিশর রাষ্ট্রের অধীনতাসূত্রে বদ্ধ হয়। কিন্তু সেই অধীনতার বিরুদ্ধে নানা পথে আন্দোলন চালিয়ে যায় তারা।

এদিকে আব্রাহাম লিঙ্কনের উদারতায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যখন দাসপ্রথা উঠে গেল, তখন বহুসংখ্যক মুক্ত ক্রীতদাসের মনে জাগলো মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ। তাদেরই একদল স্বদেশে ফিরে এসে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করলে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। স্বাধীনতার স্মারক হিসেবে রাষ্ট্রের নামকরণ করলে লাইবেরিয়া। যুক্তরাষ্ট্রেরই অভিভাবকত্বে এই ইয়াঙ্কিভাবাপন্ন নিগ্রোসমাজ শুধু যে লাইবেরিয়ায় উচ্চতর শাসক সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তাই নয়, আফ্রিকার সমগ্র নিগ্রো-জাতির মধ্যেও আভিজাত্য দাবি করলে।

ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থার একটা বাঁধা ছক আছে, আমরা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। তারা স্থানীয় নেটিভ সমাজে একদিকে জাতীয় জীবন-যাত্রাকে স্বীকার ও সমর্থন করে, আর এক দিকে এক শ্রেণীর

দেশী সাহেবসমাজকে প্রশ্রয় দেয়। কখনও উদার মনোভাবে হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করে, কখনও বা নিষ্ঠুর নিপীড়নে জর্জর করে ফেলে।

পূর্ব আফ্রিকার ব্রিটিশরাজ্য কেনিয়ার জাতীয় গণআন্দোলনের নেতা জেমো কেনিয়াট্টার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার-প্রসঙ্গেই বর্তমান ভারতের জনসাধারণ আফ্রিকান নিগ্রোজাতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম আগ্রহ বোধ করে। ক্রমে মাউ মাউ সন্ত্রাসবাদ ও সরকারী নির্যাতনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এদেশে। আমাদের বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের পরিপূর্ণ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কেনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে। আফ্রিকা তথা নিগ্রোজাতির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ মূলত তারই ফলে জেগে ওঠে। বিশেষ, যখন দেখতে পাই বিচারের প্রহসন, গণ-নেতাকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত করে তাকে বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করার ও শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা। আমরা আরও দেখতে পাই যে, তারই ফলে সন্ত্রাসবাদ কেনিয়াতেও এদেশেরই মত অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। আর চলছে বিদেশী শাসকবৃন্দের নৃশংস নিপীড়ন ও অত্যাচার।

এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের ভৌগোলিক সংযোগ ব্যাপক। বিগত দুশো বছর ধরে সমগ্র এশিয়া ছিল ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের জমিদারী। যেদিন আমরা পরাধীনতার বেদনা অনুভব করলাম, দেখতে পেলাম আর এক বিরাট কৃষ্ণাঙ্গ জাতি ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের শাসন ও শোষণের পাত্র। সেদিনই আফ্রিকার অসভ্যদের সম্বন্ধেও সভ্যতাগর্বী আমাদের মনের কোণে একটুখানি সহানুভূতি জেগে উঠলো। এই একাত্মবোধ ইয়োরোপীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে গদগদ হয়েও কোনদিন বোধ করিনি আমরা।

ভারতবর্ষ আদিম মনোভাবাপন্ন বর্বরের দেশ, সাপ ও বাঘের রাজ্য। কুসংস্কার ও আত্মকলহে আমরা কবে নিঃশেষ হয়ে যেতাম, যদি না সদাশয় ইংরেজ সরকার স্বগদ্ধিতায় আমাদের সুশাসনের ব্যবস্থা করতেন। বিশ্বজন-

অনুবাদ প্রসঙ্গে

"হাঁই বান্দুলা—হাঁই বান্দুলা—ঝিঁ কি—ঝিঁ কি—ঝিঁ কি—ঝিঁ কি—" বিকট-দর্শন একদল দ্বিপদ জন্তু উৎকট তালের ঐক্যতানী ঝঙ্কারে বিভীষিকার ঝড় তুলেছে ঃ কোন শ্বেতাঙ্গ নর বা নারী বা যুগলকে হত্যার প্রস্তুতিপর্ব। মনুষ্যদেহধারী এই পশুগুলির আকৃতি যেমন বিরাট, তেমনি ভীষণ। অঙ্গ-বাস হয়ত কিছুই নেই, নয়ত বা তা ভীষণতাবৃদ্ধিরই আনুষঙ্গিক। সর্বাঙ্গের বিচিত্র চিত্রপ্রলেপ তাদের অন্তরের হিংস্র পশুকে বাইরে প্রকট করছে। মাঝখানে হু হু করে আগুনের শিখা লকলকে জিহ্বা প্রসার করেছে আকাশে। আর তারই চারপাশে এই জিঘাংসু নরপশুগুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ বর্শা উদ্যত করে তাণ্ডব পদক্ষেপে নেচে চলেচে।

চারপাশে ঘননিবদ্ধ মহীরূহের সারি। মাথার উপর পরস্পরবিজড়িত তরুশীর্ষের চাঁদোয়া ভেদ করে আকাশের ক্ষীণতম আলোটুকুও পৌছয় না। নিরন্ধ্র পরিবেশে শ্বাস ছাড়ার অবকাশটুকুও নেই।

গাছের সারির ওপারে ঝোপঝাড়ের নিবিড় জড়াজড়ি। তারও ওপারে দিগ্‌দিশাহীন তৃণভূমি। নিরন্ধ্র তৃণগুচ্ছের দীর্ঘতায় আত্মগোপন করে সেখানেও বিচরণ করছে জীবন্ত মরণ — চিতা, সিংহ, হায়েনা। ঘাসের উপর দিয়ে দেখা যায় হাতির দোদুল্যমান কর্ণযুগল। গাছের ডাল থেকে ঝুলছে বিরাট অজগর ; যে কোন মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে জড়িয়ে ধরে নিষ্পিষ্ট করে ফেলবে। নদী হ্রদেও মুক্তি নেই। সেখানেও হিংস্র কুমীরের পাল, অথবা ভীমদর্শন হিপোর জাঙ্গাল—ভাসছে, ডুবছে, শূন্যে জলের ফোয়ারা তুলছে।

উদ্দাম প্রকৃতির নিবিড় পাহারায় পৃথিবীর আদিম ও অকৃত্রিম হিংস্রতা স্থলে জলে পশুতে মানুষে সমভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে — যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু শোভন, যা-কিছু মধুর ও শান্তিময়, তাকে বিকট ভাবে অস্বীকার করে নিষ্ঠুর জিঘাংসার জয় ঘোষণা করছে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার দৌলতে, শ্বেতাঙ্গদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও কাল্পনিক উপন্যাসের মাধ্যমে আফ্রিকার উপরোক্ত রূপই আমাদের মনে মুদ্রিত হয়েছিল।

আফ্রিকার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সাগরকূল অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। টিউনিস, মরক্কো, মিশর দেশের খবর আমরা ইতিহাস ও সংবাদপত্রের মারফত কিছু কিছু জেনেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি বুওর যুদ্ধ ও ভারতীয় ঔপনিবেশিক-দের খবরে, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহবিবরণে। অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকায় মানুষ হিসেবে তাদের সঙ্গেই ছিল আমাদের যৎসামান্য পরিচিতি, যারা ঐ মহাদেশের প্রকৃত সন্তান নয়, যারা নানা অঞ্চল থেকে নানা প্রয়োজনে, নানা প্রলোভনে ও আকর্ষণে এই ভূখণ্ডের সুগম্য ও সুরম্য অঞ্চল দখল করে বসতি স্থাপন করেছে। একমাত্র নিগ্রোদেশ, যার খবর আমরা মুসোলিনীর জঙ্গীবাদের ফলে খানিকটা জেনেছি, যাদের জন্য কিছুটা সহানুভূতিও বোধ করেছি, তা হল উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী অ্যাবিসিনিয়া। আর এই অ্যাবিসিনিয়াই একমাত্র নিগ্রোরাষ্ট্র, সুপ্রাচীন মিশরীয় যুগ থেকে যার অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে সে জাতির সংযোগ একেবারেই নগণ্য।

বর্তমান আমেরিকাতেও বিদেশ থেকে আশা মানুষেরই আধিপত্য। কিন্তু সেখানকার স্বল্পসংখ্যক আদিম অধিবাসী আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাই সমস্যা তেমন প্রবল নয়। ঔপনিবেশিকরাই সেই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আফ্রিকার সঙ্গে কোন সংযোগ স্থাপন করেনি। কেন এমনটি হয়েছে তা অনুমান করা কঠিন নয়।

অধিকতর শক্তিশালী মারণাস্ত্রই সভ্যতার বাহক। তাই যুগে যুগে সুসভ্য শক্তিগুলি অস্ত্রবলে আফ্রিকান নিগ্রোদের জীবনকে এমন তছ্‌নছ্‌ করেছে যে, নিরাপত্তার খোঁজে তারা সমগ্র সভ্যতাসংস্পৃষ্ট অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে, বাসা বেঁধেছে নিবিড় অরণ্যপ্রাচীরের আড়ালে।

প্রাচীন মিশর সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর তুর্কী সাম্রাজ্যের যুগ পর্যন্ত বিশ্বময় ক্রীতদাস হিসেবে আফ্রিকার নিগ্রোরাই ছিল প্রধান। সে যুগের বেতনভুক্ বাহিনীগুলির মধ্যেও নিগ্রোরাই ছিল সব চেয়ে দুর্দ্ধর্ষ ও সংখ্যাধিক। হ্যানিবল যে বাহিনী নিয়ে সমগ্র ইতালী দাব্‌ড়ে রোমান শক্তিকে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন আঠার বছর ধরে, তার মধ্যে নিগ্রোবাহিনীর স্থান নগণ্য ছিল না। স্বেচ্ছায় চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতো যারা, তাদের সংখ্যা ছিল সামান্য। ক্রীতদাস দিয়েই বেশীর ভাগ বাহিনী তৈরী হত।

মিশর-রোম-কার্থেজে যত মহার্ঘ রত্ন, যত মূল্যবান কাঠ, যত গজদন্ত আহৃত হত আফ্রিকা থেকে, তার চেয়ে অনেক বেশী আসতো বলিষ্ঠ সরল কর্ম্মঠ ক্রীতদাসের দল। পরাজিত জাতির নারী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে প্রকাশ্য বাজারে ক্রীতদাসরূপে সকলকে বিক্রি করাই ছিল প্রাচীনকালে শক্তিমত্তার অন্যতম পরিচয়—দিগ্বিজয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর ডাকাত লুঠেরার দলও ছিল অনেক। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর হঠাৎ চড়াও হয়ে মানুষ লুঠ করে এনে দাসবাজারে মোটা টাকা রোজগার করতো। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে কোন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ পুরুষমাত্রই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। কাজেই, একদিকে লুঠের বাজার যেমন ছিল তাদের দেশে অবাধ, পুরুষ ক্রীতদাস হিসেবে নিগ্রোদের চাহিদাও ছিল প্রচুর।

তাই প্রাচীনতম যুগ থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহের এই উর্বরতম ক্ষেত্রে মানুষের অমানুষিকতা বীভৎসতম রূপ নিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে।

মানুষের দেওয়া আঘাত মানুষের জীবনকে যেভাবে ছত্রখান করেছে যুগ যুগ ধরে আফ্রিকায়, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। মুসলিম যুগে হাবসী ক্রীতদাসদের প্রসার ভারতে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

তারপর যখন ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার চারিদিকের উপকূল আবিষ্কার করলেন, দলে দলে ইয়োরোপীয় নাবিক ও জলদস্যুর দল ছেয়ে ফেলল আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল, যা এতদিন ছিল নিরাপদ। ঘরসংসার ছারখার করে কাতারে কাতারে নিগ্রো ক্রীতদাস চালান করলো ওরা দেশে বিদেশে। আমেরিকার খেতখামার শস্যপূর্ণ হয়ে উঠল নিগ্রো দাসদের পরিশ্রমে। নতুন ভূখণ্ডে নতুন নিগ্রো জাতির পত্তন হল। বস্তুত, আমেরিকান নিগ্রোদের সঙ্গেই সভ্যজগতের জনসাধারণ আগে পরিচয় লাভ করেছে; আফ্রিকার আদিম ও মূল নিগ্রোজীবন আজও অপরিচিত।

আফ্রিকার মানুষকে ঐশ্বর্য হিসেবে লুঠ করা চলেছে যুগ যুগ ধরে। সেখানকার গজদন্ত, মহার্ঘ প্রস্তর এবং কাঠকেও লোকে সম্পদ বলে চিনেছে বহুযুগ আগে। কিন্তু মানুষ ধরতে এসেই লুঠেরার দল খোঁজ পেলে আফ্রিকার মাটির নীচে কৃপণা ধরিত্রীর যুগযুগসঞ্চিত সম্পদ লুকানো রয়েছে।

এবার আর বিদেশে নিগ্রোমানুষ চালানের ব্যবসা নয়। তার চেয়ে অনেক লাভের কারবার আফ্রিকার মাটিতে বসেই ওদের খাটিয়ে ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঝড়ের মুখে পড়ে যে উপকূলে ভাস্কো-ডা-গামা প্রাণের আশা ফিরে পেয়েছিল, সেখানকার আশা ফলে ফুলে ভরে উঠল তার স্বজাতীয়দের জীবনে নয়। ইয়োরোপ থেকে

মতকে বিভ্রান্ত করবার জন্য যেমন এই ধরনের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন ছিল, আফ্রিকার জমিদারী বজায় রাখার জন্যও তেমনি আফ্রিকান জাতিদের অসভ্যতা, নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কার এবং সেখানকার প্রকৃতির ভয়ালতম চিত্র-পরিবেশনের প্রয়োজন। যা-কিছু গ্রীক-রোমান সভ্যতার ধারক নয়, ইয়োরোপীয় নীতিবোধ ও সমাজব্যবস্থা থেকে যা-কিছু অন্য ধরনের, তাই বর্বর—এই ইয়োরো-আমেরিকান দাবির জোরেই তারা সভ্য-অসভ্য মার্কা মেরে অন্য সমাজের বিচার করে।

সভ্যতার এই বিচারে যারা অসভ্য বলে ঘোষিত, সেই ভারত তাই সেই একই বিচারে অন্য জাতি সম্পর্কে অনুরূপ ঘোষণা মনে প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারে না। সেই জন্যই আফ্রিকার জীবনযাত্রা এবং সেদেশের বিরাট নিগ্রোসমাজকে মানবেতর জীব বলে উদাসীন হয়ে থাকা ভারতবর্ষের মানায় না।

আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভূখণ্ড। প্রাচীন গ্রীকদের উপকথায় এই অজ্ঞাত রাজ্যই ছিল পাতাল। সেখানে মনুষ্যেতর বহু অদ্ভুত আধা-মানুষ কল্পনা করে প্রাচীন গ্রীক বীরদের অভিযান-কাহিনীর অজস্র রূপকথা রচিত হয়েছে। আফ্রিকা ও ইয়োরোপের মধ্যস্থ সাগর আখ্যাত হয়েছে ভূমধ্য সাগর।

গ্রীক সভ্যতা উদ্ভবেরও অনেক আগে উত্তর-আফ্রিকার পূর্ব অঞ্চলে মিশর ছিল মহাশক্তিধর সাম্রাজ্য, মানবসভ্যতার অন্যতম প্রথম লীলা-নিকেতন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সুতো কাটা ও কাপড় বোনা, বর্ণলিপি-ব্যবহার, ধান চাষ এবং কাগজ প্রস্তুত মিশরেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কিন্তু মিশরের সঙ্গে বাকী আফ্রিকার সংযোগসৃষ্টিতে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। পশ্চিমে দুস্তর সাহারা, দক্ষিণে দুর্গম বনরাজি। তাই সুয়েজ

যোজকের ঘটকালিতে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেই প্রাচীন মিশর যা-কিছু সামাজিকতা করেছে।

তারপর মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রীক সাম্রাজ্য, পশ্চিম এশিয়ায়ও তাই। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এখানে সেখানে সে যুগে গড়ে উঠেছে ফিনিশীয় বাণিজ্য-কেন্দ্র। বর্তমান টিউনিসের অনতিদূরে কার্থেজকে ঘাঁটি করে ফিনিশীয়রা ছোটখাট এক বেনিয়া-সাম্রাজ্যও পত্তন করেছিল। কিন্তু তারও দক্ষিণে ছিল সাহারা।

সর্বগ্রাসী রোমান সাম্রাজ্য যখন ইতালী জয় সাঙ্গ করে দিগ্বিজয়-বাহিনী ছুটিয়ে দিলে দিকে দিকে, তখন ভূমধ্য-সাগরের আর তিন দিকের মত দক্ষিণ উপকূলস্থ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, মায় মিশর পর্যন্ত রোমের কুক্ষিগত হল।

উত্তর আফ্রিকার জীবনে আর এক বিরাট পরিবর্তন আসে ইসলামধর্মী আরব বাহিনীর দিগ্বিজয়ে। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা শুধু যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল তাই নয়, আরবজাতি ও আরব সংস্কৃতি আচ্ছন্ন করে দিল সমগ্র অঞ্চল। তুর্কীরা যখন আরব সাম্রাজ্য দখল করলো, তখন মিশরও এল তুর্কীদের কবলে। তারপর তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতাকামী মিশরের স্থানীয় শাসক খেদিভ, সুয়েজ খাল খননের অনুমতি দানের বিনিময়ে, ইংরেজ অভিভাবকত্বে স্বাধীনতা লাভ করলো।

আফ্রিকার এই ইতিহাস হয়তো ভারত ও চীনের ইতিহাসের চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু তার মধ্যে না আছে আফ্রিকার প্রকৃতির সংস্পর্শ, না আছে সে দেশের প্রকৃত সন্তান নিগ্রোদের পরিচয়। এতগুলি দিগ্বিজয়ী শক্তি কেউ উত্তর উপকূল পার হয়ে অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। এমন কি, যে ভারত বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় লেনদেন করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, তারাও শান্ত শীতল আরব সাগর খেয়া পাড়ি হয়ে

ভারতে যাওয়ার পথে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে যে বিশ্রামঘাট তৈরী হয়েছিল, সেখানেই একদিন আজ থেকে তিনশত বছর আগে ডাচ ঔপনিবেশিকরা পদার্পণ করেছিল। তারপর ইংরেজ একদিন টের পেল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটির তলায় আছে অপরিমেয় সোনা ও হীরা, আর কালো হীরা বা কয়লার ত লেখাজোখাই নেই। ক্রমে ইংরেজরা ডাচ ঔপনিবেশিকদের খেদিয়ে সোনা-হীরা-কয়লার বিরাট কারবার ফেঁদে বসলো। ইংরেজের দেখাদেখি এমন খাসা পড়ে-পাওয়া রাজ্য দখল করার লোভে এল ফরাসী, এল বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ইতালী ; জার্মানীও এল, সারা মহাদেশটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিলে। অরণ্যব্যূহ ভেদ করে সভ্য শ্বেতাঙ্গের দল ঢুকে পড়লো আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে।

আফ্রিকা তারা দখল করলো। শ্রমিক হিসাবে নিগ্রোকে নিরীহ করবার প্রয়াসে তাদের মধ্যে প্রেম ও শান্তির প্রতীক খ্রীষ্টধর্মের প্রসার প্রচেষ্টা চললো। খনি এবং কারখানার মজুরে পরিণত করতে হলে বুনো মানুষকে যতটুকু সুসভ্য করতে হয়, তারও ত্রুটি হলো না কোথাও। কিন্তু আফ্রিকানদের মানব-সত্তা স্বীকৃতি পেল না। আমদানি করা মালের ক্রেতা হিসাবে তাদের পেতে হলে জীবনযাত্রা যে কয় ধাপ উন্নীত করতে হয়, ঠিক ততটুকু করে দিয়ে চাবুক বন্দুক বাগিয়ে শ্বেতাঙ্গ মনিব বললে—"খবরদার!" তারই ফলে আজ সাড়ে সতের কোটি কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের উপর আধিপত্য চালাচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ডে মানুষের মানব-মর্যাদা অস্বীকৃত।

আফ্রিকার প্রকৃতি ভয়াল অকরুণ। জনহীন শুষ্ক মরুভূমির বিস্তৃতি ক্রমেই বাড়ছে, অরণ্য চলেছে সরে। আর অরণ্য যেখানে আছে, সেখানেও মরণবাহী মাছির দল পশু ও মানুষকে দংশন করছে। সুসভ্য মানুষের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসে এদেরই আশ্রয়ে পালিয়ে আফ্রিকার আদিম নিগ্রোর

দল অনেকেই আজও প্রাগৈতিহাসিক জীবন যাপন করছে, ডাইনী জ্যোতিষ ও যাত্নকরকে ভরসা করে। জীবনের ভাষ্য করার ভার সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নিরক্ষরেখার দক্ষিণস্থ আফ্রিকার সর্বত্র রাত-ভোর অগ্নিস্তম্ভ লকলক করতে থাকে। এইটেই শুকনোর সময়। জঙ্গলের গাছগুলো ঠন্ঠনে হয়ে থাকে, ঘাস হয় দশ ফুট লম্বা। পোড়া ঘাসের ছাইয়ে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে বলেই ঘাসে আগুন লাগানো হয়, বাংলার পল্লী অঞ্চলে ঠিক যেমনটি ঘটে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনান্তরে। দাবানলে ত্রস্ত হয়ে জানোয়ারগুলো প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে ছোটে। তখন চলে শিকারের মওকা, পানভোজনের মহোৎসব বসে। এই ঘাস-জ্বালানো আগুন, কিংবা মহোৎসবের আঁধার-রাত আলো-করা ও মাংস-পোড়ানো আগুনকেই বিভীষিকার প্রলেপ মাখিয়ে প্রচার করা হয়েছে, নিগ্রোদের নিষ্ঠুর অমানুষিকতা ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে। যে সব অ-কৃষ্ণকায় বিদেশী জাতি চিরদিন ওদের মধ্যে হানা দিয়েছে দল বেঁধে সশস্ত্র হামলায় মানুষ লুঠ করতে, যে সব জাতের সঙ্গে ওদের যুগযুগান্ত ধরে শুধু খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—সেই সব মানুষ-ধরা জাতের লোককে বাগে পেলে ওরা জামাই-আদর যে করবে না, এই ত স্বাভাবিক।

সুসভ্য শ্বেতকায়রা অবশ্য অসভ্যদের কাছে দেবতার প্রতি আত্মনিবেদনের মত অনুগত ব্যবহার দাবি করে। আর তার ব্যতিক্রম যারা করে, তাদেরই ঘোষণা করে মানুষরূপী নরখাদক হিংস্র শ্বাপদ বলে।

এই অবস্থার অনিবার্য বিকাশ রূপেই আজ সারা আফ্রিকা জুড়ে আর এক আগুন জ্বলে উঠেছে, তা জাতীয়তাবাদের সর্বভুক শিখা—একদিন হয়তো তাই পাবক শিখারূপে মানবকল্যাণে প্রযুক্ত হবে। কিন্তু তার জন্য চাই সহানুভূতি, প্রকৃত মমত্ববোধ, ওদের মানবসত্তার ব্যাপক স্বীকৃতি।

শুধু নিগ্রোদের মধ্যেই নয়, আরব-জাতীয় বাসিন্দার দেশ মরক্কো থেকে নিগ্রো-মোম্বাসা ও সাম্রাজ্যধর্মী বুওর-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত আজ জাতীয়তার আগুন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই আগুনের দীপ্তিতে ওরা দেখতে পাচ্ছে ওদের প্রকৃত শক্তি, অনুভব করতে পারছে ওদের আত্মমর্যাদা। শ্বেত-প্রভুত্বের ভঙ্গুর কাঠামোকে ভস্ম ও ধূলিসাৎ করার স্বপ্ন আজ ওদের চোখে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগের শাসক-শাসিত ও শোষক-শোষিতের ব্যাপক সংগ্রামের সঙ্গে ওদের জাগরণ আজ আদর্শগত এবং আত্মিক ঐক্যসূত্রে গাঁথা।

শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। রাজস্ব আদায় করে এবং শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিশ্চিন্তে সম্পদ আহরণ করবে, ওদেরই পরিশ্রমে নিজেরা বিলাসে বাস করবে চিরদিন—এই ছিল ব্যবস্থা। দেশের মানুষকে ধনোৎপাদনযন্ত্রের নাট-বল্টুর বেশী মর্যাদা দেবার কোন চিন্তাই ছিল না বিদেশী শাসক-শোষকদের মনে।

যে সব অঞ্চলে ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাব লেগেছে, জাতীয়তাবাদও সেখানেই বেশী করে দানা বেঁধেছে। সভ্যতার রসটুকু সম্পূর্ণ নিজেদের জন্য রেখে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নেটিভদের সেই 'সভ্যতার পিলসুজ' হিসেবে ব্যবহার করে তারা যে বর্ণব্যবধান গড়ে তুলেছে, তার ফলে নিজের দেশেই নিগ্রোরা শৃঙ্খলিত বন্দীর জীবন যাপন করছে, লোহার গরাদের ওপাশে। দোকানে বাজারে, পথে পল্লীতে সর্বত্র ছুৎমার্গ; শ্বেতকৃষ্ণ চলতে পাবে না একপথে, এক পল্লীতে বাস করতে পারবে না, দোকানে দোকানে লোহার বেড়া, পৃথক প্রবেশদ্বার, পৃথক কাউণ্টার। কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট, হার্ভার্ড কলাম্বিয়ায় শিক্ষিত নিগ্রোও অধিকাংশ অঞ্চলে নামমাত্র বেতনের গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়া কোন কাজ পেতে পারে না। সাহেবী হোটেল-রেস্তোরাঁ থিয়েটার-সিনেমার দরজাও তার বন্ধ।

আজ কৃষ্ণকায় নিগ্রোর দল যেটুকু রুখে দাঁড়িয়েছে, তা এরই প্রতিক্রিয়া। বলছে, "আমাদের দেশে তোমরাই বিদেশী বন্দী, থাক গরাদের অন্তরালে; এগিয়ে আসবার চেষ্টা করেছ ত কতল।"

জাতীয়তাবোধের অভ্যুদয়ে ওদের জাতীয় সংস্কার কিন্তু বিদূরিত হয়নি। এখনও যাদুমন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। মন্ত্রবলেই রাইফেলের বুলেটকে জল করে দেওয়া যায়, এই ধারণা আজও বর্তমান। আজও আরণ্য গ্রামে আত্মা ও দেবতার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বলি অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি, ইয়োরোপীয় আধুনিক যন্ত্র ও ওষুধ সে কাজে ব্যবহার হয়েছে, এমন কাহিনীও জানা গেছে। নাইজেরিয়ার ইবাদানে ট্যাক্সীচালক-সমিতি দুর্ঘটনা নিবারণ-মানসে খরগোস, ছাগ ও কুকুর বলি দিয়ে লৌহদেবতা ওরাণের পূজা করেছে, তাও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

আফ্রিকার প্রাকৃত সম্পদের সীমাপরিসীমা নেই। বিধাতা তার বহিরঙ্গ উদ্দাম নিষ্ঠুরতার আবরণে ঢেকে রাখলেও, অন্তরে অজস্র সম্পদ ভরে দিয়েছে। আফ্রিকার বক্ষপঞ্জর ভেদ করে গত ষাট বছরে শ্বেতাঙ্গ বণিককুল ৪৩০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের খনিজ সম্পদ আহরণ করেছে। আফ্রিকার মানুষ, সে দেশের মাটি আসলে যাদের, এই রত্নখনিমন্থনের বিষটুকু সবখানি গলাধঃকরণ করেছে তারাই। আর জীবন বিপন্ন করে লৌহোপম পেশী আঘাতে আঘাতে শিথিল করে, খনির বিষাক্ত গ্যাসে ফুস্‌ফুস্ ও হৃদপিণ্ড ঝাঁঝরা করে, স্বদেশের সম্পদ পরের হাতে তুলে দেবার পুরস্কার পেয়েছে তারা গড়ে আঠাশ সেণ্ট শ্রমিক-মজুরী। ওদের রক্তজল-করা পরিশ্রমে জনপদ ও নগর তৈরী করিয়ে তার পর শ্বেতাঙ্গরা ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছে দূরাঞ্চলে। তাই কালা-ধলার লড়াই আজ অস্তি-নাস্তির অনিবার্য লড়াইয়ে পরিণত হতে চলেছে।

উপর-ওয়ালাদের লিখিত নির্দেশ বুঝে কাজ করার সুবিধার জন্য ওদের

যেটুকু বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, সেই শিক্ষারই জোরে ওরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেরণা-জাগানো বাণীও একটু আধটু পড়তে পারছে, পড়তে পারছে লাল সাহিত্য, কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সরল সংস্করণ ও ভাষ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওজুহাতে সব রকম রাজনৈতিক সাহিত্যের প্রচার আজ বহু অঞ্চলে নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ বাইবেল বলে একখানা গ্রন্থ আছে, যার প্রচার কোন মতেই বন্ধ করা যায় না। এই বাইবেলকেই আজ আধুনিক নিগ্রোর দল আঁকড়ে ধরে আছে। আফ্রিকান ন্যাশনাল চার্চ বাইবেল খুঁজে দেখছে, যে ইয়োরোপীয় সামাজিক আচার ধর্মের নামে চাপিয়ে ওদের স্বাজাত্য বিনাশের চেষ্টা চলছে, বাইবেলে কোথাও তার নামগন্ধটুকু নেই। তাই খৃস্টধর্ম প্রচারের ফলে নিগ্রোদের প্রাচীন ধর্মই লোপ পেয়েছে শুধু, খৃস্টানধর্ম এতটুকুও প্রতিষ্ঠা পায় নি। কেনিয়ার আফ্রিকা মিশনের শিষ্য এলাইজা মাসিন্দে-ই জাতীয় সংগঠন "দিনি ইয়া মাসাম্বা" প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর নির্বাসনের পরই জেমো কেনিয়াট্টা নিগ্রো জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য "দিনি ইয়া মাসাম্বা" তার আগেই সরকার থেকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কেনিয়াট্টার সংগঠন ছিল কিকুয়ু সেণ্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন।

আফ্রিকার আদিম নিগ্রো জীবনযাত্রা আমাদের কাছে হেয় হতে পারে না। কারণ, তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কারবিজড়িত জীবনের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের এক আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সেখানেও প্রাকৃতিক শক্তি নানা-ভাবে পূজা পেয়ে থাকে; কখনও শিলায়, কখনও নদীতে, কখনও বা বৃক্ষরূপে। পাপপুণ্যবোধ, একজনের পাপে সমগ্র সমাজের প্রতি দেবতাদের অভিশাপের আশঙ্কা, দৈবজ্ঞের গণনায় ভাবী বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিপদ খণ্ডাবার প্রয়াসে পূজাবলিপ্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তবিধান—আফ্রিকার নিগ্রো-সমাজের এই সব আচার-ব্যবহার ও বিধিবিধান ইয়োরোপীয়

বিচারে একান্ত বর্বরতা এবং আদি অসভ্য জীবনের অংশ হলেও, আমাদের সমাজে এ সবই অল্পবিস্তর বর্তমান। আমাদের অগণিত আদিবাসীদের মধ্যে ত এই সব পুরোমাত্রায়ই রয়েছে।

নিগ্রোসমাজের আর একটি বিশেষ বিধান আমাদের উচ্চ-বর্ণীয়দের মধ্যেও শাস্ত্রবিহিত বিধায় এমন প্রবল ভাবে চেপে বসে আছে যে, তাকে আইন করে বাতিল করার চেষ্টাও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। সে হল, সগোত্র ও ও সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহের নিষেধ। নিগ্রোরা হয়তো তার অন্য নাম-করণ করে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা দুক্ষেত্রেই এক। একই পূর্বপুরুষের বংশধরদের মধ্যে বিবাহ উভয় ক্ষেত্রেই মহাপাপ এবং জ্ঞাতিসম্পর্কের ভাই-বোন আপন ভাই-বোনেরই সামিল। পূর্বপুরুষ আমাদের ক্ষেত্রে কোন ঋষিরূপে কল্পিত হয়ে গোত্র-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, আর ওদের ক্ষেত্রে কল্পিত পূর্বপুরুষের স্থান গ্রহণ করেছে কোন পশু। এই পরবর্তী প্রথাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'টোটেম' আখ্যা দিয়ে সগোত্র বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থাকে বলেছেন 'টাবু'। এবং টোটেম ও টাবুকে আদিম বর্বরতার বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করেছেন। 'কাজিন'রা যে কি করে ভাই-বোন হয় ভেবে বিস্ময় বোধ করেছেন ইয়োরো-আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্। অথচ আমাদের 'কাজিন' সত্যি ভাই-বোন এবং সে হিসেবে টোটেম ও টাবু রূপান্তরে আমাদের মধ্যেও পুরোপুরিই বর্তমান।

অথচ ইয়োরোপীয় শিল্পবিস্তৃতি ও বেনিয়াসংস্কৃতির আঘাত ওদের সমাজেও লেগেছে এবং তা সমাজ-জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে। গোষ্ঠিবদ্ধ আদিম বন্যজীবন আজ বিলুপ্তির পথে। অধিকাংশ গ্রামেই আজ এমন দু-চারজন আছে, যারা খনিতে ও কারখানায় কাজ করে এসেছে, সঙ্গে এনেছে বিলেতী মদের আস্বাদ ও ঝাঁঝ এবং যৌনব্যাধি। এরা প্রত্যক্ষ করে এসেছে শোষণ ও নির্যাতন, পেয়েছে অবিচার। তাদের

মানবসত্তার অস্বীকৃতির বেদনায় হৃদয় বিষিয়ে নিয়েই এসেছে তারা গ্রামাঞ্চলে। তারাই উপলব্ধি করেছে যে উর্বর ও প্রাকৃত সম্পদে সম্পন্ন অঞ্চল শ্বেতাঙ্গদের জন্য দখল করে নিগ্রোদের অনুর্বর অঞ্চলে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হল কম মজুরীতে শ্বেতাঙ্গ মনিবের জন্য দাস ও শ্রমিক সংগ্রহ করা। অনুর্বর অঞ্চলের মানুষ নিগ্রোদের মজুরবৃত্তি না করে কি-ই বা উপায় আছে আজ।

প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত করেই ইংরেজ আমাদের দেশে প্রথম বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। ভারতে যে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ জেগেছিল তার রাশ টেনে ধরেছিল সুসভ্য ভারতীয়দের দীর্ঘ দিনের সংযম ও শান্তির ঐতিহ্য, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির শালীনতাবোধ এবং মানবধর্ম। তাছাড়া, সুপ্রাচীন সভ্যতার ধারক কৃষিপ্রধান ভারতীয়, তথা বাঙালী জাতি, স্বভাবতই নিরীহ প্রকৃতির। তবু বিদেশী শাসক-শোষকের নিপীড়নে মাঝে মাঝে আমাদের সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাতের প্রবৃত্তি জেগেছে, সৃষ্টি হয়েছে বিপ্লববাদ।

আফ্রিকান নিগ্রোরা কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্যের ঐতিহ্যপুষ্ট নয়। বন্যশিকারীর জাত তারা। পরস্পর যুদ্ধ করে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। দেহে বা মনে যেখানেই আঘাত পাক, সে আঘাতে স্বভাবতই তাদের প্রকৃতির আদিম স্বভাবযোদ্ধা সঙীন উঁচিয়ে জিঘাংসু হয়ে উঠবেই।

নিগ্রোদের জীবন চিরদিনই পশুপালনপ্রধান। গরু মোষের পাল ছিল তাদের সম্পদ, তাদের বিশ্রান্তালাপের বিষয়বস্তু। কোন্ ষাঁড়টা জোয়ালের কোন্দিকে জুড়লে কেমন ভাবে চলে, কোন্ লাল গাইয়ের পিছনের সাদা ডোরাটা তিনপুরুষ পর্যন্ত সমানে চলেছে, কোন্ গাইয়ের

লেজের গোছাটা কালো অথচ তার বাছুরের লেজের গোছাটা হয়েছে লাল, কোন্ গাইটার একটা কালো বাছুর পরে ষাঁড় হয়ে শুধু কালো বাছুরই জন্ম দিয়েছে, এই সব বংশপরিচিতি ওদের নখদর্পণে। গরু মোষের শিংকে কত কায়দায় জড়িয়ে পেঁচিয়ে পাকিয়ে কত চারু ও কারু শিল্পে পরিণত করেছিল ওরা। আজ ওদের পশুপলানক্ষেত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। চাষের উপযুক্ত জমি, অর্থকরী বন—সব কিছুই শ্বেতাঙ্গদের সম্পত্তি। আদিম বন্য জীবনের অনিশ্চয়তার প্রতি বিরাগ এসেছে, সভ্যতার বিলাসরূপের দূরাগত ধ্বনি বেজেছে কানে। তাই আজ ওরা ব্যর্থ, পর্যুদস্ত। ভীষণ ভয়াল আফ্রিকার প্রকৃতিগত বন্য নিষ্ঠুরতা বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্বেতাঙ্গরাই ওদের গ্রামের কুটির ছাড়িয়ে শহরে এনেছিল, পাতার বা পশুচর্মের পোশাক ছাড়িয়ে কোট-প্যাণ্ট পরিয়েছিল, শিখিয়েছিল রেস্তোরাঁ সিনেমা ও ইংরেজী ভাঙা ভাঙা দু-চারটে বুলি। আজ বেগতিক দেখে বলছে, সাহেব সাজা চলবে না। রেস্তোরাঁয় জটলা করাও বারণ। আর গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের বাহন ভাষা ও লিপি শিক্ষাও যতদূর সম্ভব বরবাদ করে দেবার প্রয়াস চলছে। অরণ্য অঞ্চলের বাইরে আধুনিক জনপদে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে দেবেনা নিগ্রোদের, চিরদিন বনবাসী থেকেই ওরা সভ্য শ্বেতাঙ্গের সেবা করবে, এই ব্যবস্থাই প্রতিদিন দৃঢ়তর হচ্ছে।

নিগ্রোরা যে শিক্ষাদীক্ষা পেলে সব কিছুতেই শ্বেতাঙ্গ মাপকাঠিতে সমান সুসভ্য হয়ে উঠতে পারে, এ খবরটুকু গোপন রাখার চেষ্টার অন্ত নেই। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যেমন মিথ্যাবাদী রাখাল বালক, অলস পিয়ন ও লেট লতিফের গল্পই ফলাও করে শেখানো হয়েছে, ভারতের পাঠ্য পুস্তকেও সাহসী বালক মাত্রই ইংরেজ, বিদেশীর চোখে ভারতের রূপ তুলে ধরা হয়েছে ভিখারী, সাধু, সিপাই ও নাচওয়ালীর ছবির

মাধ্যমে, আফ্রিকানদেরও তেমনি বন্য আদিম রূপ ছাড়া অন্য কোন পরিচিতি গোপন করা হয়েছে দুনিয়াময়; বড় জোর অদক্ষ অপটু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরূপ এক-আধ ঝলক দেখান হয়েছে।

কিন্তু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা বাধা সত্ত্বেও নিগ্রো-মণীষা কতদূর যেতে পারে, তার অজস্র প্রমাণ আছে আমেরিকায় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। শুধু পল রোবসন, লিয়ারী কনস্টাণ্টাইন বা ফ্রাঙ্কি ওরেলের মত হলিউড-চমকানো মনোরম বিদ্যুৎদীপ্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ বা খেলোয়াড় নয়, এই কিছুদিন আগেই কলকাতায় ব্রিটিশ গায়নার তরুণ নিগ্রো-নেতা বার্নহামের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রাচীনরাও স্বীকার করেছেন যে, কলকাতায় যে সব শ্রেষ্ঠ বক্তার ভাষণ শোনা গেছে, বার্নহাম সেই স্বল্পসংখ্যক প্রকৃত বাগ্মীদের অন্যতম। শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত ডাঃ বাঞ্চের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। অথচ প্রথম যুগে পল রোবসনের অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভাকে ইংরেজ শাসকের স্তুতিগানে এবং নিগ্রোদের হেয়ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সবাক-চিত্রের মাধ্যমে।

আমরা জানি না বটে, কিন্তু আফ্রিকারই দু-এক অঞ্চলে এখন নিগ্রো ছেলেরা যে-কোন সভ্য দেশেরই মত কলেজ হস্টেলে থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ে মেয়ে-পুরুষ একই সঙ্গে পড়াশুনা করছে, ক্রিকেট খেলছে। তারপর পড়া সাঙ্গ করে এম. এল. সি. মুখ্য-মন্ত্রী হচ্ছে, ইংরেজের দেওয়া স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় নাইট-হুড পেয়ে হাই-কোর্টের জজও হচ্ছে। অর্থাৎ ইংরেজের অভিভাবকত্বে আমাদের যতখানি অধিকার মিলেছিল, যে সব অঞ্চলে নিগ্রোরা তার ছিটে-ফোঁটা পেয়েছে, সেখানেই যোগ্যতা প্রমাণিত করেছে ওরা। ইংরেজেরা যাই বলুক না কেন, আমাদের সভ্যতা, বুদ্ধি এবং মণীষা বহু হাজার বছরে বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কাজেই ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা চটপট রপ্ত করার জন্য খুব বেশী কৃতিত্ব আমরা দাবি করতে পারি না। কিন্তু বুনো বর্বর আদিম হিংস্র আফ্রিকান যখন তা রপ্ত করে, তাদের জাতিগত অযোগ্যতার বদনাম তাতেই খণ্ডন হয়ে যায়। তাই না সে খবর বাইরের জগৎ থেকে সযত্নে গোপন রাখতে হয়।

কিন্তু শিক্ষিত ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন আফ্রিকান নিগ্রোর সমস্যা আমাদের চেয়ে জটিলতর। আমরা আমাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা থেকে বিছিন্ন না হয়েই ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আফ্রিকান নিগ্রোদের আদিম বন্য জীবনযাত্রার সঙ্গে ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার একটা উৎকট অসঙ্গতি রয়েছে। তাই তারা সাহেব হতে গিয়ে সমাজ থেকে, স্বীয় ঐতিহ্য থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ ইয়োরোপীয়ানরা তাদের আপনার জন বলে স্বীকৃতি দেয়নি, কালো বলে গরাদের ওপারেই ঠেলে রেখে দিয়েছে।

আজও আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার লক্ষ্যে তেমন করে দৃষ্টিক্ষেপে করেনি। তাদের প্রাথমিক দাবি—মানুষ বলে স্বীকৃত হবার দাবি। হয়তো ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সমান অধিকারও তারা আজ পর্যন্ত চায়নি। কিছুটা ছোট হলেও মানুষ তারা, ইতর জীব নয়—এই মর্যাদাটুকুই তারা চায়।

কোন সদাশয় মনিব পাওয়া যে জীবনের পরমার্থ, সেই কুকুর-জীবন ওদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। কালো গায়ের থেকেও যে কাটলে সাদা গায়ের মত একই রকম লাল রক্ত বেরয়, এটাতে ওরা প্রথম প্রথম বিস্ময় বোধ করেছিল, বর্তমানে এ নিয়ে শ্লেষ করে শুধু।

তাড়িয়ে নিয়ে বনপ্রাচীরের অন্তরালে ওদের আত্মগোপনে বাধ্য করে ছিল সভ্য মানুষ, আজ সেই গর্তে পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে লোভী মানবকুল ওদের

মরিয়া করে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পালিয়ে বাঁচবার সম্ভাবনা নেই দেখেই আজ সহস্র ফণা উদ্যত করে উঠেছে বন্য বাসুকীর দল। ওরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, হয় শ্বাপদের মত আপন আরণ্যরাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে, নয় সভ্য মানবের পূর্ণ মর্যাদা দাবি করবে। কৃষ্ণকায়া নগ্নদেহা নিগ্রো যুবতীর কষ্টিপাথর-কোঁদা নিটোল দেহে ও কালো চোখের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আফ্রিকার নিগ্রো তরুণরা আজ এই আহ্বানই অনুভব করছে—হিংস্র বীরই তাদের কাম্য, দাস বা কুকুরকে ঘৃণা করে তারা।

মানবতা যুগ যুগ ধরে সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত হয়েছে আফ্রিকায়। আজ সে প্রতিবাদ করতে চাইছে। শ্বেত মনিবের দল তার টুঁটি চেপে ধরলেও, প্রতিবাদে আজ নিরক্ষ অঞ্চলের আরণ্য আকাশ ও মরু থম্‌থমে্। আজ যেমন একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আর এক দিকে আরব অঞ্চল বারুদস্তূপ বলে স্বীকৃত হচ্ছে, ঠিক অনুরূপ ভাবেই আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের জন্য বিক্ষোভ ও শক্তি সঞ্চয় করেছে নিগ্রো আফ্রিকায়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে বোঝাপড়ার দৌত্য আজ যতখানি প্রয়োজন, আফ্রিকার বিরাট মানবসঙ্ঘের মনুষ্যস্বীকৃতির প্রয়োজন তার চেয়ে এতটুকুও কম নয়। পশ্চাতে যাকে রাখবো, সে যে পশ্চাতে টানবে, এই অমোঘ সত্য ঋষিবাক্য যে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাই নয়। আজ তার প্রয়োগক্ষেত্র সমগ্র মানবসমাজ।

বিক্ষোভ আজ সারা নিগ্রো আফ্রিকায় এমনভাবে পুঞ্জীভূত যে, বহু অঞ্চলে সন্ধ্যার পর কোন শ্বেতাঙ্গ ঘর থেকে একা বার হতে সাহস পায় না। লোহার দরজা জানলায় সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যাদের দিন কাটে, তারা শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায় হলেও জীবন তাদের দুর্বহ। দক্ষিণ অফ্রিকার কোন শ্বেতাঙ্গ গৃহকর্ত্রী তাঁর আশৈশব পালিত নিগ্রো বালক-ভৃত্যকে পরম আত্মীয়তার সুরে প্রশ্ন করেছিলেন—"হ্যাঁরে, গোলমাল শুরু

হলে তুই কি আমাদের খুন করবি?" ভৃত্যটি জবাব করেছিল—"ছি ছি! তাও কি হয়, আমি যদি খুন করি ত অন্য বাড়ীর সাহেব-মেমদের করবো; তোমাদের খুন করবে পাশের বাড়ীর চাকর!" সারা আফ্রিকা জুড়ে নিগ্রোদের মুখে আজ এক বুলি "সোফাজোঙ্কে" অর্থাৎ—আমরা মরব। এই 'মরব' শব্দেই একাধারে ওদের আশা ও নৈরাশ্যের প্রকাশ। ওরা মরিয়া; অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করছে, মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু বরণ করেই যদি বাঁচার উপায় হয়।

তাই যুগান্তরের কবিকে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, মানহারা মানবী আফ্রিকার দ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য। আজ যুগান্তর-প্রাপ্ত স্বাধীন ভারত বিশ্বমানবের স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছে। প্রতিবেশী আফ্রিকা সম্পর্কে সচেতনতা তার পক্ষে অপরিহার্য।

কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাইয়ের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও আধুনিক কেতাদুরস্ত ভারতীয়ের সঙ্গে মোলাকাত যেমন বিদেশীর পক্ষে ভারতের পরিচয় নয়। আফ্রিকা এবং সে দেশের নিগ্রো মানুষকে বুঝতে এবং জানতে হলে ডাঃ বাঞ্চে, পল রোবসন, ফ্র্যাঙ্কি ওরেল, সেরেৎসে খামা বা গোল্ডকোস্ট-টোগোল্যাণ্ডের ইংরেজীনবীশ নেতৃবৃন্দ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় অবান্তর না হলেও, একান্তই অসম্পূর্ণ। দেশবাসীর চিরদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা যাদের, ঐতিহ্যগত জীবনদর্শন এবং চিরাচরিত বিধিনিষেধ আচার ও সংস্কারে বিজড়িত হয়ে দিন কাটায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্বদেশের স্বাভাবিক পরিবেশে, তাদের পরিচয়ই জাতির প্রকৃত পরিচয়। গ্রামবাসী চাষী-ভারত, উপকূলবর্তী ধীবর-ভারত, আদিবাসী শিকারী-ভারত, খনি-কারখানার অকুশী শ্রমিক-ভারতকে যে না দেখবে না বুঝবে, দর্শন-উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী যতই সে বুঝতে চেষ্টা করুক, দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতার পথে পথে প্রচুর ফটো তুলে বেড়াক, যতই উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখুক, যতই সফর

করুক অজন্তা-ইলোরা-সাঁচী-সারনাথে, উত্তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গে যতই অভিযান করুক, মোলাকাত করুক নেহেরু-রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে, ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতা কোনদিন তার ঘুচবে না। কোনমতেই সে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনের পরিচয় লাভ করতে পারবে না। আজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথের বাঁকে ভারতীয়দের কি সমস্যা, কোনদিন সে তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

আফ্রিকার নিগ্রোমানুষের আজকের সমস্যার প্রথম পাঠও তাই নিতে হবে তাদের অরণ্যপরিবৃত সংস্কারজড়িত আদিম গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে পরিচিতি অর্জন করে।

অশিক্ষিত সংস্কারবদ্ধ গ্রাম্য ভারতবাসীরই মত আদিম আফ্রিকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন আছে, আছে অনবদ্য জীবনাদর্শ ও নীতিবোধ —যা হয়তো কোন কোন বিষয়ে আধুনিক সভ্যতাকে লজ্জা দেয়। জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ঝুড়ি বুনতে পারে যারা, অন্যায় করে যারা, বিবেকদংশনে জর্জর হয়, গোষ্ঠীর কল্যাণে যারা নিজেকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়, তারা বনবাসী এবং নগ্ন দেহে অভ্যস্ত হলেও বর্বর নয়, সহজ বিশ্বাস এবং জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলেও স্যাভেজ নয়, একথা আজ মানতেই হবে।

বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন—মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রো নেতা জেমো কেনিয়াট্টাও তেমনি বলেছেন—সব কিছু দোষগুণ-কুসংস্কার নিয়েই আমার দেশবাসী আমার ভাই। আজ বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে পদক্ষেপ করতে, আমাদেরও সেই মনোভাব নিয়েই এগোতে হবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিগর্বের মিথ্যা বাধা ভেঙে ফেলে, আজও যারা অপরিচয়ে ঘোমটার আড়ালে দূরে থেকে পর হয়ে আছে, দোষেগুণে তাদের গ্রহণ করতে হবে আপনার জন বলে।

কল্লোল যুগ থেকে আমরা বিশ্বসাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বমানবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের প্রয়াস পাচ্ছি। বর্তমানে অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। কিন্তু তথাকথিত সভ্য সমাজের জীবন-যাত্রাই আজও আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়বস্তু।

গায়ক-বন্ধু সন্তোষ সেনগুপ্তের ঘরনী শ্রীমতী অরুণার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে আফ্রিকান আরণ্য জীবনের খানকয়েক বই আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে, এবং সেনগুপ্ত-দম্পতীরই কথায় র‍্যাটরে·র 'লেপার্ড প্রিস্টেস' বইখানি পড়তে নিয়ে আসি। তখন পর্যন্ত বইখানি বাংলায় অনুবাদের কথা এত-টুকুও মনে জাগেনি। বইখানা পর পর দুজনে পড়ে ভারতের গ্রাম্য-জীবনের আদিম জীবনদর্শন এবং সামাজিক আচার বিচারের সঙ্গে নিগ্রোজীবনের সমস্যা, তাদের আশাআকাঙ্খা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আদিম নিগ্রোজীবনের প্রকৃত স্বরূপ বাংলার জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরবার বাসনা জেগে ওঠে। বিশেষ করে আফ্রিকার নিগ্রোজীবনের নিষ্ঠুর ভয়াবহ চিত্রেই আমরা এযাবৎ অভ্যস্ত ছিলাম বলেই, বাসনা দৃঢ়তর হয়। তারই ফল এই "বাঘিনী কন্যা"। 'লেপার্ড' আমাদের 'চিতা' হলেও তা বাঘ।

আফ্রিকার আরণ্য পরিবেশ, গাছপালা, পশুপাখী, মূলে যেমনটি আছে, তেমনটিই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থে বর্ণিত অনেক কিছুর সঙ্গেই আমাদের পরিচয় নেই। সেই সবকে কোন পরিচিত নামে ডাক্‌তে পারলে হয়তো আমরা তাদের সঙ্গে একটুবেশী আত্মীয়তা বোধ করতাম। কিন্তু আফ্রিকার বন্য পরিবেশের স্বকীয়তা তাতে ব্যাহত হত। যে সব গাছ লতা পশু পাখী একান্তভাবে আফ্রিকার, তাকে নামান্তর করে বোঝাবার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। ছড়া, প্রবাদ এবং জনশ্রুতিগুলিও নিছক অনুবাদ করেই ছেড়ে দিয়েছি। এমন কি উৎসর্গ পত্রখানিও মূলের অনুবাদ, অবশ্য তার সঙ্গে অনুবাদকদ্বয়ের অন্তরের মিল আছে।

সেনগুপ্ত-দম্পতী তাঁদের সংগৃহীত দুর্লভ গ্রন্থখানা আমাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বইখানার ক্ষতিও হয়েছে যথেষ্ট। তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ যে বাণী ঘোষণা করেছিলেন, আফ্রিকার প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন প্রচেষ্টার ভূমিকা হিসেবে সেই কবিতাটি উদ্ধৃতির চেয়ে সার্থক আর কিছুই হতে পারে না ঃ

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথানাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে

আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে॥

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এলো ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,—
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে॥

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা,
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা॥

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি ;
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো, "ক্ষমা করো"—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী॥

গ্রন্থ-পরিচিতি

স্টিফেন গ্বীন

[ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। অক্সফোর্ডের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বর্তমানে ডাব্‌লিন-বাসী। — অনুবাদক]

আমি যতদূর জানি, এই গ্রন্থের একটি মাত্র জুড়ি আছে। তবে এই দুখানি গ্রন্থের মধ্যে মিলের চেয়ে পার্থক্যই বেশী লক্ষণীয়।

'বাতোয়ালা'য় নিগ্রো লেখক রানে মারে স্বজাতীয়দের চিত্র এঁকেছেন। এদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। এই গ্রন্থের অনবদ্য চিত্রধর্মিতা এবং প্রকাশের জোরালো ভঙ্গীর গুণে তিনি ফ্রান্সের 'গাঁকুর' পুরস্কার অর্জন করেন। নিরক্ষীয় নিগ্রো-জীবনের প্রদীপ্ত বর্ণাঢ্যতা তিনি ছাপার হরফে ধরতে পেরেছেন। নাকাড়ার বোল এই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলেছে।

তবু ইউরোপীয়দের কাছে যা-কিছু দুর্বোধ্য হতে পারে, সে সবই পরিহার করেছেন লেখক। তাঁর কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে সেই সব প্রবৃত্তিই প্রকাশ পেয়েছে, মানুষের সেই সাধারণ কামনা, প্রেম ও ঘৃণা, লোভ ও প্রতিহিংসা— বর্তমান সভ্য সমাজের যে-কোন লোকের মনে যা সাড়া জাগাতে পারে। তিনি গ্রন্থে যা প্রকাশ করেছন, তা আমাদের অতিপরিচিত বিষয়; শুধু পরিবেশের জন্যই তা অদ্ভুত ঠেকে। শিল্পী হিসাবে তিনি চিত্র এঁকেছেন। যে জনসমাজের

জন্য তাঁর অঙ্কন, তাদের জ্ঞান ও বিচারবোধের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই কাজ করেছেন তিনি।

ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্‌রে কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ। তাই তিনি কঠিনতর কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি যে কাহিনী বলেছেন, তার প্রত্যেকটি চরিত্র পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো। ইউরোপীয় তথা সমগ্র সভ্য সমাজ থেকে তারা এত দূরে, যে শ্বেতকায় মানুষের নামটুকুই হয় ত বড় জোর শুনেছে তারা।

মারে-র কাহিনী নিগ্রোদের নিয়ে রচিত হলেও, ইউরোপীয় প্রভাব সেই নিগ্রোদের কাছাকাছিই বর্তমান। সর্দারের প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমিক যুবক একদিনের পথ হেঁটে গিয়ে পুলিশে নাম লিখিয়েই তার প্রতাপ এতখানি বাড়িয়ে তুলতে পারে, যে সর্দারও তাতে ভয় পায়।

কিন্তু এইটেই মূল পার্থক্য নয়। ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্‌রে্‌-র সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এমন কোন কাজ বর্ণিত হয় নি, যার মূল প্রবৃত্তি ইউরোপীয় বা অন্য সভ্য সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তবু এমন নিবিড় সহানুভূতি নিয়ে কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে যে, এই দুর্দম নাটকীয় রূপকথার শেষ পর্যন্ত আমরা অপরিসীম দরদ ও আগ্রহ নিয়েই পড়ে যাই। আমার নিজস্ব অনুভূতি থেকে বলতে পারি, অপরিসীম আনন্দও পাই তাতে।

আমরা যাঁর কাছ থেকে কাহিনীটি শুনছি, তিনি দীর্ঘকাল আফ্রিকার ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে বসবাস করেছেন, বহু আফ্রিকান গ্রামে অগ্নিস্থলীর চারপাশে জমায়েত জটলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজেই কাহিনী রচনার সময় প্রতিটি দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর চোখের সামনে বাস্তব রূপ নিয়ে ভেসে উঠেছে। আফ্রিকার জীবনযাত্রার যে মাধুর্য ও মাদকতা তিনি আহরণ করেছিলেন, তা কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠেছে। ফলে সে জীবনের সৌন্দর্য, তার বিস্ময়, তার অপরিচিতি, এমন কি তার নিষ্ঠুরতা পর্যন্ত আমরা বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিই।

তা ছাড়া, যারা শিকারপ্রিয়, তাদের প্রত্যেকের কাছে এই কাহিনীর এক দুর্দম আবেদন আছে। পশ্চিম আফ্রিকায় যত রকম জানোয়ার বিচরণ করে, সব রকমই শিকার করেছেন লেখক। কিন্তু তার এতটুকু ইঙ্গিত পর্যন্ত না করে, তীর-ধনুক, নিজস্ব সাহস ও নৈপুণ্যই যাদের সম্বল, সেই আদিম শিকারীর দক্ষতাকেই তিনি সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। একক ওপোকু কি ভাবে জলাভূমির দল-ছাড়া বিরাট হাতিটাকে অনুসরণ করে হত্যা করল, সে কাহিনী যে অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, আমার মনে হয়, এ জাতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে তা মর্যাদা পাবে। যে লোক জীবনে একবারও যে-কোন রকম শিকারে গিয়েছেন, শিকারের সূক্ষ্মতম বিষয়গুলির সঙ্গে লেখকের নিবিড় পরিচিতি তিনি অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু এই গ্রন্থের গুরুত্ব আরো গভীর। মেরি কিংস্‌লে বলতেন যে, আফ্রিকানকে যদি বুঝতে চাও, তবে চিন্তাকেও নিগ্রোভাবাপন্ন করতে হবে। এ নীতি যদি কেউ বাস্তবে গ্রহণ করে থাকেন, তবে তা ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্রে-ই করেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার আদিম আধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তিনি। অনন্যমনা হয়ে তাদের আচার ও বিধি-বিধান অধ্যয়ন করেছেন। এবং তার ফলেই তিনি সরকারী নৃতত্ত্ববিদরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ যাতে জানতে পারে—কি বিশ্বাস, কি মনোভাব, কি রীতি-নীতি ও আচারব্যবহার স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি নির্ণীত করে, এই উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর নিয়োগ।

সরকারী পদাধিকার বলে ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্‌রে যে সব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছেন, তার প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা অপরিসীম। মেরি কিংস্‌লে ছাড়া অন্যান্য যে-কোন পণ্ডিতের রচিত ঐ ধরনের রচনার মত, এই সব নিবন্ধও বিশেষজ্ঞ এবং ওই বিষয়ে দীক্ষিতরাই শুধু পাঠ করে থাকেন।

বর্তমান গ্রন্থে কিন্তু শিক্ষার্থী, শিকারী এবং আফ্রিকা-প্রেমিক র‍্যাট্‌রে আফ্রিকার সঙ্গে অন্য সমাজের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচিতির প্রয়াস পেয়েছেন। কামনা ও দুঃসাহসিক অভিযানের এই কাহিনী আফ্রিকানদের সাধারণ নরনারী হিসাবেই উপস্থাপিত করেছে। সুখ দুঃখ, আশা ভয়, কামনা ও সংশয়ে ভরা এই মানুষগুলিকে সহজেই বুঝতে পারি, ভালবেসে ফেলি। তাদের প্রেম ও দুঃসাহসিকতা, আদিম বর্বর জীবনের অংশ হিসেবে আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও, পরিবেশের নৈপুণ্যে তা আমাদের অন্তরেও সমান দোলা দেয়। ওদের মধ্যে সম্মানবোধ অত্যন্ত তীব্র ও শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্লেষ ও উপহাস মৃত্যুর অধিক বিভীষিকা। অধিকন্তু ওদের সমাজের প্রতিটি নরনারী গোষ্ঠীর কল্যাণকে শ্রেয় জ্ঞান করার শিক্ষা পেয়ে থাকে।

একজন আফ্রিকানের প্রেম ও শিকার কাহিনী এ নয়, আফ্রিকানের বিবেকই এখানে মুখ্য প্রসঙ্গ। সমাজবিধি লঙ্ঘন করে পরস্পরকে ভালবেসেছিল এক যুগল। তাদের এই বাস্তব কাহিনীটি আফ্রিকানদের কাছ থেকেই শুনেছিলেন ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্‌রে।

ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এদের মধ্যে কোন রক্তের বাধা ছিল না। কিন্তু আফ্রিকানদের মধ্যে এদের প্রেম অসিদ্ধ, কারণ একই চিতাবাঘ গোষ্ঠীর মানুষ এরা। ওদের বিচারে তাই এই প্রেম নিষিদ্ধ-সম্পর্কের প্রেম। শুধু এই একটি মাত্র বিধান লঙ্ঘিত হয়েছিল, তাই নয়। মেয়েটি ছিল পূজারিণী। তার পূজারিণীত্বের কাল গত হয়ে বিবাহের অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত সেও পূজার্হা, প্রেমার্হা হতে পারে না। অধিকন্তু, তাদের প্রেম-মিলন ঘটেছিল অনাবৃত মৃত্তিকার উপর, তাও নিষিদ্ধ; কারণ তার ফলে দেবী-বসুমতী কলুষিত হয়।

আমরা দেখতে পাই, সাবালকত্বের পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে, দীক্ষার ঠিক আগে, তরুণ শিকারীকে যে ভাষণ দেওয়া হয়, তাতে পাপের

কি পরিণাম, তা ভাল করেই সে জেনেছে। আরও দেখতে পাই, তার অনুশোচনা ও ভীতি, নিজের জন্য নয়, তার প্রিয়তমার জন্য; তার চেয়ে বেশী—সমগ্র গোষ্ঠীর জন্য। সাহসী বীরের ভীতি এ। হাতি শিকারের যে দুঃসাহসিক অভিযান, তা নিছক শিকারের উত্তেজনা এবং শিকারলব্ধ সামগ্রীর লোভেই নয়। সর্বত্র গুজব রটেছে পূজারিণীর যদি মর্যাদা-হানি ঘটে থাকে, তবে যে বিষবাণের সে সেবাইত, নিশ্চয়ই তার শক্তিক্ষয় হবে। এই গুজব বন্ধ ও ব্যর্থ করার জন্য পূজারিণীর প্রেমিক-পুরুষ যাত্রা করে, বিষ-বাণের শক্তি কী তীব্র, তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে। শুধু বিবেকের প্ররোচনায়ই সে যাত্রা করে না; কারণ বিবেকের নির্দেশ শুনলে সে সব কিছু স্বীকার করে ফেলত। তাদের দুজনের পাপের শাস্তি থেকে প্রিয়তমাকে রক্ষা করাই তার কাম্য।

কিন্তু প্রিয়তমা এভাবে রক্ষা পেতে চায় না। কারণ দুজনেই মানুষ। মানুষে মানুষে যে মনোভাবের বৈচিত্র্য, এদের মধ্যেও তা বর্তমান। যে বিধি-বিধানে বীর নায়ক ভীতিগ্রস্ত, নায়িকা তাকে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। আদিমতম সমাজেও বিদ্রোহীর অভাব নেই, নায়িকা সেই দলের। আর নায়ক, ভুলবশত তার স্খলন হয়ে থাকলেও, বিধিবিধান মেনেই সে চলতে চায়।

সব মানুষকে একই ছাঁচে ফেলা ইউরোপে যেমন চলে না, আফ্রিকায়ও তেমনি। এই আফ্রিকান কাহিনী আমাদের বলে দেয়, আইনকে কেমন করে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কারণ শিকারী বীর সন্দেহ-নিরসনে কৃতকার্য হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবতারা শাস্তি বিধান করে। বিয়োগান্ত নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে কাহিনীর পরিসমাপ্তির অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে।

আফ্রিকার জীবনযাত্রার আর একটি বিষয় আমরা জানতে পারি—কি অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে গুজব সমগ্র দেশের উপর অভিসম্পাতের

আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয়, কি ভাবে দৈবজ্ঞের পরামর্শ নেয় লোকে, কি ভাবে সকলের সংশয় ও আশঙ্কা দৈব কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং সব শেষে, কি ভাবে গোষ্ঠীর বর্ষীয়ানবর্গ বিষয়টি পুরোহিত-প্রধান ভূস্বামীর কাছে উপস্থাপিত করে।

কি ভাবে রাজতন্ত্র পরিচালিত হয়, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তাও দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে, কি ভাবে সর্দার-ভূস্বামী লক্ষণবিচার হওয়ার পর বর্ষীয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সবশেষে সাধারণবুদ্ধিসম্মত এবং সর্বজন-গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে তাদের পৌঁছে দেন, যে রায় জনমতের অনুকূল, তারই উপর ধর্মীয় অনুমোদনের ছাপ মেরে দেন। আপাতদৃষ্টিতে যে সব আইন যুক্তি-বিচার-সাপেক্ষ নয়, তাও কি করে আফ্রিকান সমাজ-জীবনে যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে, তারও চিত্র এর মধ্যে পরিস্ফুট।

যা অদ্ভুত এবং বর্বর মনে হয়, তা এই ভাবে বোধগম্য ও মানবোচিত হয়ে ওঠে। ক্যাপটেন র‍্যাট্‌রে-র গ্রন্থে ও মারে-র গ্রন্থে এখানেই পার্থক্য। দুই গ্রন্থেই আফ্রিকার অদ্ভুত সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিভাত। কিন্তু 'বাতোয়ালা'য় যে সব নরনারীকে দেখি, তারা স্বাভাবিক প্রচলিত প্রবৃত্তিবশেই কাজ করে যায়। তবে তাদের কাজের মধ্যে একটা আদিম বর্বরোচিত রূঢ়তা সব কিছুকে এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ রূপ দেয়। র‍্যাট্‌রে-র গ্রন্থে আমরা যে নরনারীকে দেখি, তারা যে সব বিধি-বিধান মেনে চলে, তা আমাদের কাছে একেবারে যুক্তি-বিচার বর্জিত মনে হয়। কিন্তু তার পরিণতি এমন কিছুতে, যার সঙ্গে প্রেমময় মানবতার সম্পর্ক নিবিড়। আর কোন গ্রন্থ পাঠেই আফ্রিকার অন্তরকে এমন ভাবে দেখার অনুভূতি লাভ করিনি। ক্যাপ্‌টেন র‍্যাট্‌রে-র বিজ্ঞানসম্মত নৃতত্ত্বের নিবন্ধগুলিতে নয়ই। এমন কি, মেরি কিংসলে-র নৃতত্ত্বমূলক দীর্ঘ মন্তব্যগুলির মধ্যেও নয়, যদিও সেগুলি মনোহর হাস্যরসে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

কিন্তু কিংসলে নিজেই মেনে নিতেন যে, র‍্যাট্‌রে আফ্রিকায় যত বছর কাটিয়েছেন, তিনি তার অর্ধসংখ্যক মাসও সেখানে বাস করেন নি। আর চলাফেরা করেছেন যাদের মধ্যে, তাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর যৎসামান্য মাত্র পরিচয় ছিল। যেসব বিশ্বাস এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে মেরি কিংস্‌লে নৈবন্ধিক বর্ণনা দিয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি প্রত্যক্ষ কাহিনীর ভিতর দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। আদিম সমাজ, আর যে আরণ্যজগতে সেই সমাজ অবস্থিত, এই ভাবের চিত্রের মধ্যেই তা রূপায়িত হয়েছে। যে শিকারী জন্মগত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী, তার চিত্রময় স্মৃতির মধ্যেই সব কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। অর্ধজীবনব্যাপী ঘনিষ্ঠ পরিচিতির জোরেই সব কিছু লক্ষ্য করা হয়েছে তা নয়। আদিম জীবনের ক্রিয়াকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হয়, কি কারণে সেগুলি গড়ে ওঠে, এই সব বুঝবার শিক্ষাও লাভ করেছেন নৃতত্ত্ববিদ্ র‍্যাট্‌রে। তাঁর দৃষ্টি ও মন দুই-ই এর মধ্যে কাজ করেছে।

এদের জীবনে যা-কিছু অদ্ভুত, সর্বত্রই তা আমাদের মন আকর্ষণ করেছে। হয়ত এখানে সেখানে এই অপরিচিতি আমাদের কাছে বিস্বাদ, কোথাও বা বিভীষিকাময় মনে হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ ওদের সামগ্রিক জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছে। সর্বোপরি, কাহিনীটি যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি উত্তেজনাময়। আফ্রিকান ভাষার প্রতিটি শব্দ ও প্রবাদ সম্পর্কে যিনি অবহিত, আফ্রিকান মনের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ যাঁর পরিচিত, তিনি যখন খুলে দেখান, তখন আফ্রিকার সমগ্র অন্তরের পরিপূর্ণ রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়।

মুখবন্ধ

ওপোকু ও আমালাগানেই ছিল এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকার আসল নাম। অন্তত ওই নামেই ওরা পরিচিত ছিল। প্রাচীনপন্থী কোন আফ্রিকান কখনো স্বেচ্ছায় নিজের আসল নাম প্রকাশ করে না। কারণ, নিজের নাম জানিয়ে দিলে সে তৃতীয় শ্রেণীর যে-কোন ডাইনীর খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।

কাহিনীটি উপন্যাসরূপেই রচিত হয়েছে। কিন্তু মূল ঘটনাগুলি এবং অধিকাংশ সংলাপ আমি আমার আফ্রিকান বন্ধুদের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই ধরে দিয়েছি। আমার চরিত্রগুলিকে আমি ঠিক তেমনিভাবে কথা বলাতে এবং কাজ করাতে চেষ্টা করেছি, ছলাকলাহীন অনাড়ম্বর আফ্রিকান যেমনটি করে। পরিবেশের প্রভাবও ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

আমি যা লিপিবদ্ধ করেছি তার অধিকাংশকেই বোধ হয় নৃতত্ত্ব বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই ধরনের নীরস উদ্দেশ্যে আমি প্রবৃত্ত, একথা আমি এখনি অস্বীকার করছি। কিন্তু আমার আশা আছে যে, এই ভাবে কাহিনীটি প্রকাশ করায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কারণ আফ্রিকার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক বিধিবিধান, শাসন-সংবিধান ও ধর্ম বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেই আমরা এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক সরকারী পরিকল্পনা খাড়া করছি। এই পরিকল্পনাগুলি স্থানীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বলা হলেও, তা নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার পাশ্চাত্য রূপ মাত্র; অবশ্য একটা সূক্ষ্ম ছদ্মবেশ তাতে পরানো থাকে।

আফ্রিকান জীবনের এই কাহিনীটি আমাকে যারা জানিয়েছে, তারা অবশ্য আমারই মত তাদের জীবনকালেই এই গ্রন্থে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও জাতিসম্প্রদায়গুলিকে তথাকথিত রাজা বা রানীর শাসনাধীনে মিলিত হতে দেখেছে। কিন্তু আমি জানি এবং অতীত ইতিহাসজ্ঞ প্রতিটি আফ্রিকানও জানে যে, এই লোক-দেখানো রাজ্যপ্রধান রাজনৈতিক পুতুল-নাচের পুতুল ছাড়া কিছুই ছিল না। আর সেই সব সামন্ত রাজ্যের প্রতিটি পুরুষ এবং নারী জানতো এবং বুঝতো যে, সেই পুতুল-নাচের দড়ি টানবার তারও অধিকার আছে।

এইভাবে এককালে রাজভক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা হত। যে ধরনের শাসককে আমি এই কাহিনীতে চিত্রিত করে সর্দার-ভূস্বামী বলে অভিহিত করেছি, তাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের যখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়, ইউরোপীয়দের মনে হয়েছিল যে তারা যথেচ্ছ ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে, তাদের মুখের কথাই আইন, সবাই তাদের ভয় করে, সবাই কর দেয় ও আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে এই নরপতি সেই গোষ্ঠীর প্রাচীনতম পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ বংশধরদের মধ্য থেকে বর্ষীয়ানদের দ্বারা নির্বাচিত হত। তার রক্ষণাবেক্ষণে মাটি যদি উর্বরা না হত তবে তাকে গদিচ্যুত করতে পারত। সে ক্ষেত্রে তাকে ফিরে যেতে হত, তার 'রাজা' হওয়ার পূর্বেকার বৃত্তিতে, তা চাষবাস কামারের কাজ বা শিকার—যাই হোক না কেন। এই রাজার ছেলেরা পাছে পিতার উচ্চপদ দাবি করে বা মিথ্যা গর্বে গর্বিত হয়, তাই তরুণ বয়সে তাদের হেয় কাজের ভার দেওয়া হত - গোবর-গাদার অথবা ছাইগাদার তদারকী। বর্ষীয়ানদের এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও সম্মতি ছাড়া সর্বসমক্ষে কিছু বলা বা করা রাজার পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। আবার প্রজাদের পক্ষ থেকেও বর্ষীয়ানদের উপরেও একই ধরনের বাধা-নিষেধ চাপানো ছিল। বাইরে থেকে যথেচ্ছ-শাসন ছাড়া কিছুই মনে হত না, আর এই কল্পনাকে প্রশ্রয়ও দেওয়া হত। কিন্তু

বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার মুখ থেকে যা-কিছু বার হত, তা আগে থেকেই বর্ষীয়ান-দের দ্বারা আলোচিত হত, এবং সে বিষয়ে তাদের মতও স্থির হয়ে যেত। আসলে এই বর্ষীয়ানরাই ছিলেন সমাজের প্রকৃত শাসক।

"যুগ যুগ ধরে আফ্রিকানরা রাজভক্তি পোষণ করছে বলে ইউরোপীয়ানরা ধারণা করে রেখেছে; তার মূল কারণটুকু কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি। এর মূলে ছিল মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতি। পূর্বপুরুষদের তৃপ্তি ও স্তুতি ছিল সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। সামাজিক পদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য, এসবের ভিত্তিও ছিল তাই। সর্দার-ভূস্বামী থেকে সাধারণ গৃহ-কর্তা পর্যন্ত সবার বেলাই এই একই ব্যাপার ছিল। এই গৃহস্বামী বা পারিবারিক কর্তাই সর্বসমাজে সভ্যতার মূল ভিত্তি। প্রাচীন আফ্রিকায় যে-কোন ক্ষমতার আসনে বসার অর্থ ছিল—ক্ষমতা অপেক্ষা দায়িত্বের বোঝা বহন করা। বাহ্যত কোন বর্ষীয়ানকে আর পাঁচজনের চেয়ে ধনী মনে হত। কিন্তু তার কারণ, তিনি অনেকের হয়ে কোন সম্পত্তি পরিচালনা করতেন। প্রধান সর্দারকে ভূস্বামী বলা হত, কারণ সমগ্র গোষ্ঠীর জমিজমা রক্ষণ ও পরিচালানর ভার তারই উপর।

এ রকম সমাজেই ওপোকু এবং আমালাগানে তাদের সামাজিক জীবনের শিক্ষা লাভ করেছিল। যে সব গৌণ বিষয়ে আনুগত্য গোষ্ঠী-প্রধানের সঙ্গে যোগসূত্র গেঁথে দেয়, সাধারণ নরনারী সামাজিক শিক্ষার ভিতর দিয়েই তা আদান প্রদান-করতে শেখে।

পরিবারের মত গোষ্ঠীও যৌথ সংগঠন। এদের কাজ ও চিন্তা দু-ই যৌথ ধারায় চালিত। এ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হল: যাকে আমরা পরস্পরের কাজের জন্য নৈতিক দায়িত্ব বলি, তা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ইউরোপীয়দের চেয়ে এদের মধ্যে অনেক বেশী বিকাশ লাভ করেছে। এই পরিবেশে ব্যক্তি-স্বার্থ এবং যৌথ-স্বার্থে যে সংঘাত অনিবার্য তাই প্রকাশ পেয়েছে এই কাহিনীতে।

কারণ, আমার কাহিনীর চরিত্রগুলি মানুষের স্বাভাবিক বাসনা-কামনা-সমন্বিত রক্ত-মাংসেরই সাধারণ মানুষ।

আফ্রিকান জীবনের যে দুটি প্রচলিত রীতির উপর এই কাহিনীর ভিত্তি, সাধারণ পাঠক তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাহিনীর ভিতর দিয়ে রীতি দুটি যতখানি বিবৃত হয়েছে, তার চেয়েও বিশদ বিশ্লেষণ না করলে পাঠকদের পক্ষে তার প্রকৃত গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে। কাহিনীটিকে সংক্ষেপে 'ভাই-বোন'-এর প্রণয়কাহিনী বলা যেতে পারে। এমন প্রেম ও তার অনিবার্য বিপর্যয় আমার বর্ণিত সমাজে দুর্লভ নয়। তবু ওপোকু ও আমালাগানের সম্পর্কের বাধাটা আমাদের হিসেবে বাধাই মনে হয় না। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে আফ্রিকানদের সম্পর্কের সংজ্ঞাগুলি তথা-কথিত সভ্যসমাজ-ব্যবহৃত সংজ্ঞা থেকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলছি ঃ বাবার ভাইয়েরাও সবাই ওদের ভাষায় 'বাপ্'। বাবার স্ত্রী মাত্র 'মা'। আর ইংরেজী 'কাজিন' শব্দে যে বহুব্যাপক সম্পর্ক বোঝায়, আফ্রিকায় তাদের সবাই ভাই-বোন। এগুলি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে মুখে বলার সম্পর্ক নয়। এই সংজ্ঞাগুলি পরিপূর্ণ গুরুত্ব নিয়েই পুরুষ ও নারীর যৌনসম্পর্কে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা ছিল ইংরেজী ভাষার 'কাজিন'। তবু ওদের সমাজে ওদের মধ্যে বৈধ মিলন সম্ভব নয়। ওদের কাছে এদের মিলন রক্তসম্পর্কের বাধা-নিষেধলঙ্ঘনযুক্ত অবৈধ সঙ্গম; দুর্দম ক্রোধে দেবতা ও আত্মার দল এই পাপের শাস্তি বিধান করবেই। সে শাস্তি অনিবার্য ধ্বংস, তা নেমে আসবে শুধু ব্যক্তিগত ভাবে পাপীযুগলের উপর নয়, সমগ্র গোষ্ঠীর উপর।

দ্বিতীয় যে আচারটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে তা হল ঃ 'ছেদন' বা নারীর যোনিত্বকচ্ছেদ। এই ছেদন না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন নারী অগম্যা। কিন্তু ছেদন পর্ব সমাধা হলেই আফ্রিকান প্রবচন যা বলে—পড়শীর কুমড়ো

ক্ষেতে সে লাফিয়ে বেড়াতে পারে। কারণ অদীক্ষিত কেউ যদি অনবধান বশত লাফিয়ে যায়, তাহলে তাতে ফসলে অভিশাপ নেমে আসবে—এই বিশ্বাস। যে বয়সে এই অস্ত্রোপচার সাধিত হয়, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি, একই অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তার পার্থক্য আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মের দিন কয়েক পরেই অস্ত্রোপচার হয়, কোথাও বা পাঁচ-ছ বছর বয়সে, আর কোথাও বা বর্তমান কাহিনীর অনুরূপ, বালিকা ঋতুমতী হলে পর 'ছেদন' হয়। অনুষ্ঠানটা প্রকাশ্য ও সর্বজনীন। অস্ত্রোপচার হয় আনাড়িভাবে এবং ক্ষতকে বীজাণুমুক্ত রাখার কোন ধারই ধারে না কেউ। ছেদক 'পোকুবুগা' একটুকরো মরচে ধরা লোহা দিয়ে তার কাজ সারে, ফলে রক্ত বিষিয়ে যাওয়া, কি শিরা কেটে যাওয়া—এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত দুর্লভ নয়।

তা যাই হোক না কেন, আচার এবং প্রচলিত ব্যবহারের শক্তি এমন প্রবল যে, ছেদন যাদের হয় নি তাদের নিন্দা এবং শ্লেষ এত তীব্র যে, মনে দারুণ ভয় সত্ত্বেও মেয়েরা নিজেরাই ছেদনে এতটুকু অনিচ্ছা বা আপত্তি পোষণ করে না।

নরমাংস ভক্ষণ, বিষপানে দোষী-নির্দোষ পরীক্ষা, গলাটিপে বা পুড়িয়ে ডাইনীকে হত্যা করা, যমজ সন্তান বা সদন্ত নব-জাতককে মেরে ফেলা, বৃদ্ধ এবং অশক্তদের মৃত্যুব্যবস্থা—এই সব রীতিই বর্তমানে ইউরোপীয় সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ছেদনের বেলায় ঠিক তা হয় নি। এখনও আফ্রিকার বহু অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। শুধু যে অনুষ্ঠিত হয়, তাই নয়, শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় অনেকেই এই রীতির সমর্থন করেন এবং তা প্রচলিত রাখার দাবি জানান। যাঁরা এই বীভৎস আচারটিতে হস্তক্ষেপের বিরোধী, তাঁদের যুক্তি বিশ্লেষণ করা কঠিন নয়। আফ্রিকানদের মধ্যে আজ একজাতীয় মতবাদ গড়ে উঠছে। আফ্রিকান

আচার ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা বেদনাদায়ক এবং সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ও মমত্ববোধ বিবর্জিত। কিন্তু তা বলে বিদেশী এবং বিজাতীয়েরা এসে তাদের চিরন্তন সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করবে, তাও তারা সহ্য করতে রাজী নয়। কোন কোন আফ্রিকান এবিষয়ে কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। মনে মনে সেকেলে জাত-ভাইদের প্রতি তারা অবজ্ঞাই পোষণ করে, ঠাট্টা-টিটকিরি করতেও ছাড়ে না। তারা মনে করে, ইউরোপীয় রীতিতে চলাই প্রগতি। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যদি এগিয়ে এসে বলে, তোমাদের অমুক রীতি খারাপ এবং তা বন্ধ করতে হবে, তা হলে ওরাই কোমর বেঁধে প্রাচীন আচারে বিজাতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করবে।

যে স্বল্প সংখ্যক শ্বেতকায় নরনারী 'আইন করে বন্ধ করার চেয়ে' এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত থাকার পক্ষে মত দেন, তাঁরা হয় আফ্রিকানদের বিক্ষুব্ধ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, অথবা তাঁরা সেই উন্নাসিক পাণ্ডিত্যগর্বী নৃতাত্ত্বিকের দলে, যাঁরা ক্ষমতা থাকলে আদিম সমাজের জীবন ধারাকে অব্যাহত রাখার আগ্রহে এই সব মানব গোষ্ঠী থেকে সভ্যতার সমস্ত সংস্পর্শ ঠেকিয়ে রাখতেন। তাঁরা ভুলে যান, মহৎ সংস্কৃতি যা-কিছু, সবই সংস্কৃতি-মিশ্রণের ফল।

এই মুখবন্ধটি হয় ত শ্বেতকায়দের প্রতি প্রচারবাণী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিশদতর যে কাহিনীটি আমি এবার বিবৃত করব, এ তারই ভূমিকা এবং আমার প্রিয়বন্ধু ও এককালের দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যেই তা বলা হয়েছে। তারা হল—চিতাবাঘ গোষ্ঠীর নর-নারী।

আর. এস. আর.

বাঘিনী কন্যা

প্রথম অধ্যায়

‘খাবার তৈরী ঠাক্‌মা’—বলে ওঠে আমালাগানে, আমালাগানে মানে পরমা রূপসী।

কুঁড়েঘরের এককোণে কাঠের আগুন। তেলা আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো মুছে নিয়ে বাঁকাতেড়া ছোট একটা কাঠের টুল ও পা দিয়ে সেদিকে ঠেলে দেয়। তার পর দু হাঁটু সুন্দর করে পিছন দিকে মুড়ে দিয়ে, নিজে বসে পড়ে একটা চাটাইয়ের উপর। সামনেই একটা কালো মাটির সানকিতে রাতের খাবার।

বাইরের উঠোন থেকে কাঠের বড় হামানদিস্তার ধুপধাপ শব্দ ভেসে আসে; শোনা যায় ধান ভানার একটানা আওয়াজ—অবিরত পরিবর্তনশীল তার সুর ও ছন্দ। ভেসে আসে কলগুঞ্জন ও হাসির খিল খিল। আর তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে শোনা যায় রাতের মত গোয়ালে বন্ধ গরু-মোষের পায়ের থপ্‌থপ্‌ শব্দ। দূরের উঠোনে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে। কাছাকাছি হিংস্র জন্তু চলাফেরা করছে বুঝতে পেরেই চেঁচায় ওগুলো।

জেগে ওঠে একটা জবুথবু মূর্তি। মাথায় তার সাদা পশমের মত কোঁকড়ানো পাকা চুল। শতচ্ছিন্ন একটা হাতে তৈরী মোটা কম্বলে দেহটা ঢাকা। দু হাতের মুঠোয় ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে মাটির বেদীটা থেকে

টলতে টলতে সে উঠে এগিয়ে আসে। ঘরের কোণের ওই বেদীটাই ওর খাটিয়া, ওখানেই শুয়ে ছিল এতক্ষণ।

তরুণীর হাতে পায়ের পিতলের বালা ও খাড়ু ঠুংঠাং করে ওঠে, আর কোমর থেকে সামনে ও পিছনে ঝোলানো পাতাগুলোয় খস্ খস্ শব্দ হয়। আটার ঢেলার মত বড় বড় সাদা গোল্লাগুলোর উপর খানিকটা মাংসের ঝোল ঢেলে দেয় ও, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'এমন খাসা মাংস কোথায় পেলি?' জিজ্ঞাসা করে বুড়ী। তারপর অনেক কষ্টে ও ধীরে ধীরে নীচু হয়ে সেই মেয়েটির রাখা ছোট টুলের উপর বসে পড়ে।

'গেল মাসে ওপোকু যে মাদী হাতীটা মেরেছিল, তারই শুঁড়ের একটা টুকরো', জবাব করে তরুণী।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বুড়ী এক গাদা থুথু ফেলে আগুনের মধ্যে। ছট্ ছট্ শব্দ ওঠে আগুনে। একটা ঘেয়ো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল একেবারে আগুন ঘেঁষে। শব্দ শুনে এক লাফে খাড়া হয়ে উঠে বার দুই বিকট ঘেউ ঘেউ করে। আবার শুয়ে পড়ে তখুনি, যেন বড় ক্লান্ত। হয় ত বা যেটুকু পরিশ্রম করেছে, তাই যথেষ্ট মনে করছে।

'খা ঠাক্মা', বলে তরুণী একটা জলের বাটি এগিয়ে দেয়। বুড়ী তার কম্পমান আঙুলগুলো ডুবিয়ে নেয় তাতে। রূপসীও হাতটা ধুয়ে ফেলে। তারপর শুকোবার জন্যে শূন্যে হাতটা দোলাতে থাকে। ঠাকুমা খাবার থেকে এক টুকরো ভেঙে তা ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে নেয়, অনেক কষ্টে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মেঝের উপর রাখে টুকরোটা।

'কাল এই সময় এক সঙ্গে খাব', বিড় বিড় করে বলে বুড়ী। তরুণীকে নয়, যে পিতৃপুরুষের আত্মার সঙ্গে তার যোগ দেবার ক্ষণ আসন্ন, তাদের উদ্দেশেই এই উক্তি।

'আচ্ছা ঠাক্‌মা, ওরা তা জানে,' বলে রূপসী, 'কিছু গলায় নামাতে পারিস কি না, চেষ্টা করে দেখ্‌। তুই আমাদের ছেড়ে যাবার সময় খিদে নিয়ে যাবি, তা আমরা হতে দেবো না। তা ছাড়া, লোকে বলে, সে অনেক দূরের পথ।'

'তোর ছ্যাদন পর্যন্ত যদি থেকে যেতে পারতাম,' বলে বুড়ী, নাতনীর খাবার অনুরোধ কানেও তোলে না। ধীরে ধীরে ফিরে বসে বুড়ী, তার পর দুর্বল হাতে তরুণীর ঘাড়টা ধরে, বলে, 'তুই ভিটের বদনাম করিস না। ছ্যাদন ঠিকমত হয়ে গেলে মরদ্‌রা সবাই তোকে জোয়ান কুমারী বলে খাতির করবে।'

আমালাগানে হঠাৎ তড়াক করে ঘুরে বসে, তার পেতলের গয়নাগুলো এবার ঝম্‌ ঝম্‌ করে ওঠে। একটা ঝুড়ির এক পাশে ফুটো দিয়ে ধান ঝরছে, আর একটা মুরগি সেখানটায় প্রাণপণে ঠোক্‌রাচ্ছে। 'হুঁস!' করে তাড়া দেয় রূপসী। মুরগিটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না।

'কি ঠাণ্ডা রাত, কাঠের আগুনটা একটু উস্কে দে দিদি।'

প্রশান্ত মুখখানা কাৎ করে একটা গাল মেটে মেঝের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে দেয় রূপসী, তারপর ধীরে ধীরে ফঁু দিতে থাকে নিভে আসা কাঠের আগুনে। ধপ করে জ্বলে ওঠে শিখা, লাফিয়ে ওঠে ধোঁয়ায় কালো মাকড়সার জালে ভরা কড়িকাঠ পর্যন্ত। তরুণীর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বিড় বিড় করতে থাকে বুড়ী।

'হ্যাঁ, দেখতে তোকে ভালোই, কিন্তু আমি এক কালে যেমন ডবকা ছিলাম, তুই ঠিক তেমনটি নস্‌। কুঁকড়ে নদীর জলের মত ঢেউ-তোলা হয়ে গেছে আমার গায়ের চামড়া। কিন্তু একদিন তা ওই গোবরগাদার পোকা-গুলোর মত মোলাম ও চক্‌চকে ছিল। আর এই যে শুকিয়ে ঝুলে পড়া থলে দুটো, এ দুটো ছিল নিটোল; চলবার সময় কেঁপে কেঁপে উঠত।'

বলতে বলতে দুহাতে নিজের চর্মাবশেষ স্তন দুটি একবার নেড়ে দেয় বুড়ী।

'জানি ঠাক্‌মা, আর সবাইও তা জানে।' বাধা দিয়ে বলে আমালাগানে। 'কাল রাতে নাচের উৎসবে গাইয়েরা সবাইকে জানিয়ে দেবে—তুই কি ছিলি। কিন্তু এখন কিছু খাবার চেষ্টা কর্‌। ওরা যে বলে, অনেক দূরের পথ।'

হারানো যৌবনের স্বপ্নে বাধা পড়ায় বুড়ী ক্ষুণ্ণ হয়। হয় ত বা আসন্ন যাত্রার কথাটা বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়াটা পছন্দ হয় না। রাগের সঙ্গে বলে ওঠে, 'খা! তুই খাচ্ছিস্‌ কি? চুপ করে মুখখানা প্যাঁচার মত গুমরে বসে আছিস! কে পচাইগুলো নষ্ট করলে প্রথম জ্বাল দেওয়ার সময়? হামানদিস্তা বেয়াড়া করে পিটিয়ে বোনের আঙুল থেঁৎলে দিলে কে?' বুড়ীর শ্লেষোক্তিগুলি ক্লান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

রূপসী উঠে এগিয়ে যায় ঘরের আর এক প্রান্তে। খুঁটির ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়া একটা গাছের ডাল থেকে টাটকা পাতার ঝাড় ভেঙে নেয় কতকগুলো। নিতম্বের উপর আল্‌গা করে দড়ি দিয়ে যে পাতাগুলো ঝোলানো ছিল, সে গুলো ফেলে দিয়ে নতুন পাতা বেঁধে নেয়। তার পর বুড়ীর দিকে ফিরে বলে:

'যাই দেখি নাচের উচ্ছবের পচাইগুলো গেঁজালো কি-না। যদি না-ই খাবি ঠাক্‌মা, শুয়ে একটু জিরো গিয়ে।'

হাতে পায়ে হামা দিয়ে মৌচাকের মত দরজাটা পেরিয়ে উঠোনে বেরিয়ে আসে রূপসী। বাইরে এসেই সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রবেশ মাত্রই সবাই পরম উল্লাসে স্বাগত জানায় তাকে, 'আয়লো রূপসী, আমাদের সঙ্গে ধান ভানবি আয়।' তারপর হামানদিস্তায় পাড়

দিতে দিতে গাইতে শুরু করে ঃ

ছ্যাদন আমার হয়ে যেতে
লাফিয়ে যাব কুমড়ো ক্ষেতে !

ঘরের মধ্যে বুড়ী বিড় বিড় করতে থাকে ঃ 'ছ্যাদন পর্যন্ত যদি থেকে যেতে পারতাম। ··· জলা থেকে অনেক উঁচু খাড়াই পাহাড়, তলার পাথরগুলো এড়াতে হলে অনেক দূরে লাফ দিতে হবে ··· কাল রাতে কুমীরগুলো শব্দ করছিল যেন সিঙ্গির হাঁক ··· বাড়ীর আমার যেন ইজ্জৎ নষ্ট না হয়।' তারপর সুর পালটে বলে, 'ওরই মারা হাতীর মাংস বটে !'

এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে বুড়ী। কুকুরটা নিভন্ত আগুনের দিকে সরতে সরতে একেবারে গরম আঙ্গারগুলোর মধ্যে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ কি মনে করে বুড়ী উঠে পড়ে, তার পর যে কোণে সে খাবারের গ্রাসটা ফেলে ছিল সেদিকে ফিরে বলে, 'সবাইকে বলিস, কাল আমি রওনা হব।'

ঘরের মধ্যে বুড়ী একাই বসে। কিন্তু আবার সে মৃত আত্মাদের উদ্দেশ করে কি বলতে শুরু করে। জীবিতের কাছে কাছেই থাকে মৃতেরা। টুল ছেড়ে উঠবার সময় বুড়ী হাতের লাঠিটা দিয়ে ঠেলা মেরে কাৎ করে দেয় ওটা, পাছে যেসব ভূতকে ও এতক্ষণ সম্বোধন করেছে তাদের কেউ বসে পড়ে তার উপর। ভূতের বসার পর জীবিত যে কেউ বসবে টুলে, বাতের ব্যথায় ভুগতে হবে তাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তরুণ শিকারী ওপোকু কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে আছে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে নামছে ঝরনা, তারই নীচেকার জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির অথচ অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে।

'ফেনাগুলো সাদা থেকে ঘোলাটে হতে দেখলাম, এখন আবার সাফ জল ছুটছে'—আপন মনেই বলে ওপোকু। তারপর মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে থাকে—'পম্ পম্ পম্—পম্সা।' ছুটো পাথরের ফাঁকে জলের খলখলানি প্রকাশ করবার জন্য একটা শব্দ আবিষ্কারের চেষ্টা করে

বাঁ কাঁধে ঝোলানো তূণ থেকে টেনে বার করে একটা তীর, ধারালো ফলাটা পরখ করতে থাকে, স্ট্রোপান্থাসের বিষে সেটাকে আবার ডুবিয়ে নেওয়া দরকার কি-না। কিন্তু ঠোঁট ছুটো ফুলিয়ে শব্দ করা চলতেই থাকে ওর, 'পম্ পম্ পম্ পম্সা।' পিছনের ঝোপ থেকে একটা খোঁচা লাগায় সঙ্গে সঙ্গে ও ফিরে তাকায়, বাঁ হাতটা দেয় ধনুকে।

'কি! তোর বাণগুলোও!' নীচেকার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা প্রশ্ন করে। ধনুক থেকে হাত নামিয়ে নেয় ওপোকু। জিজ্ঞাসা করে 'কি বলতে চাস্?'

'বলতে চাই,' অপর লোকটি জবাব করে, 'ছুবারের চেষ্টায় তবে আমি সেই বোঙ্গোটাকে ঘায়েল করেছি, বাচ্চা ষাঁড়গুলোর তাড়া খেয়ে একা একা চরছিল সেটা। পাকা ফসল থেকে পাখী তাড়াবার জন্য খোকারা যে খেলাঘরের তীর ছোঁড়ে, তাতেও ওটুকু ঘায়েল করা যেত।'

'তোর কব্জি ছুবলা হয়ে পড়েছে, হাত কাঁপে। পচাই খাওয়া থামা। আর নতুন বউকে পাঠিয়ে দে তার মার কাছে, চাষের কাজে তার সঙ্গে হাত লাগাতে পারবে।' বলে ওপোকু হেসে ওঠে।

কথার খোঁচাটা অগ্রাহ্য করেই বলে চলে লোকটা, 'গণৎকারের কাছে গিয়েছিলাম, তার ডাণ্ডাটা সব কিছুর উপর ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা চিজে ছোঁয়া লেগে গেল—যাতে মনে হল, কোন দেব্‌তার থান নোংরা হয়ে গেছে।'

দুজনেই একটুকাল চুপ করে থাকে, তারপর ওপোকু প্রশ্ন করে, 'বুড়োদের ঝাঁপ দেওয়ার সময় তুই সেখানে ছিলি? শেষ হয়ে গেছে সব?'

'ঝাঁপ দেওয়া! হ্যাঁ, তাই ওরা বলে,' জবাব করে অপর যুবক; 'কিন্তু অনেকের বেলায় ওটাকে ঠেলে ফেলাই বলা উচিত।'

'কেন? ভিটের বে-ইজ্জৎ কে করলে?'

'শোন্', লেটিয়ে বসে পড়ে লোকটা। ফলের শুকনো খোলাটা যে হাতে ধরেছিল, তারই একটা আঙুল দিয়ে গোটা দুই টোকা মেরে খানিকটা নস্যি ঢেলে দেয় ওপোকুর খোলা হাতে। তার পর বলে চলে,

'বুড়োদের মধ্যে সাতজন সাহস করেই লাফিয়েছিল; কিন্তু যখন বুড়ীর পালা এল, তার পেট ভয়ে ফুলে উঠেছে। অন্তত তাই মনে হলো। পিছিয়ে গিয়ে কি যেন বলতে চাইল বুড়ী।' একটু থেমে ভারী একটিপ নস্যি টেনে নেয় লোকটা, তারপর হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে, 'দেবতার দিব্যি, ছুঁড়ীটা কিন্তু খাসা।'

'হায়েনার মত হাসছিস যে, কোন ছুঁড়ীটা?'

'হা হা হা হা,' করে হাসতেই থাকে লোকটা। তার পর কোনমতে সামলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে। আবার হাসি এসে বাধা পড়ার আগেই বক্তব্যটা সেরে ফেলতে চায়।

'বুড়ীর শুকনো পাছায় একটা ঠ্যাং তুলে দিয়ে খাড়াই থেকে ঠেলা মেরে ডিগবাজি খাইয়ে ফেলে দিলে তাকে।'

'কে? রূপসী?'

'আর কে? এখন দৈবী গণনা করে দেখা হবে, বুড়ী পিছোচ্ছিল

কেন ? মরে ত গেছে, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল তা জানতে হবে।'

'লাফ দেওয়া পর্বে সর্দার হাজির ছিল কি ?' ওপোকু জিজ্ঞাসা করে। 'আমি এখানে এসেছিলাম মাছ ধরা পোলোটা দেখতে, এক-আধটা ঈল ধরা পড়েছে কি-না। বছরের ভেটটা পাঠাতে হবে কি-না মালিককে !'

'ছিল বৈ কি ! বিষ্টি যে হচ্ছে না তা নিয়ে কথাও কইলে আমাদেরসঙ্গে। বললে, 'মাটি আগুনে পুড়ছে। সাদা ঝোড়ো মেঘ জমে ওঠে তুলোর থোপার মত, কিন্তু সব সময়েই তা সরে যায়। আকাশের দেবতার বাজ হেঁকে ওঠে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বউ দেবী-বসুমতীর পেট কিন্তু শুকিয়ে হাঁ করেই থাকে। কেন বিষ্টি পাচ্ছি না, আমরা তা জানবার জন্য ছেদনের আগে দেবতার থানে একটা বলি দিতে হবে।"

'আকাশে গোল ধব্‌ধবে চাঁদ উঠলে জলার ব্যাংগুলো যেমন গ্যাঙ্‌র গ্যাঙ্‌র করে, তেমনি একতালে বক বক করেই চলেছিস্,' মন্তব্য করে ওপোকু। 'গোড়ায় বললি তোর তীরের তেজ নষ্ট হয়ে গেছে। দেখ্‌ আমার গুলো ঠিক আছে এখনো।' হাতীর ল্যাজের চুলে বেণী পাকানো বালা একটা ও হাতে পরেছিল। প্রমাণ স্বরূপ সেটাকে খুব আল্‌গোছে মুচড়ে দেয়। তার বলে, 'বিষ্টি হবে ঠিকই। মেঘেরা তাদের আসার খবর দেয়। নাচিয়েদের মত ছুটে বেরুবার আগে বার বার এগোয় আর পিছোয়, এই রেওয়াজ। দেখ্‌, এই মুহূর্তে আকাশের দেবতার ধনুক দেখা যাচ্ছে।'

'হয় ত তাই' বলে সঙ্গী, 'কিন্তু যাই বলিস, আকাশ-দেবতা যদি রেগে গিয়েই থাকে, আমি তাতে অবাক হই না। আজ কাল ভালো ভালো পূজো পায় যত ডাইনি, পরী, ভূতুড়ে জীন, পাহাড় ও নদীর দেবতা। আমার খুড়ো বলেছিল তাদের কালেও এ সব দেওকে ততটা আমল দেওয়া

হত না। আকাশের দেব্‌তা, পৃথিবীর দেব্‌তা আর বাপ-পিতাম'র আত্মা—এদের পূজো-বলিই ছিল যথেষ্ট। আজ কাল ছোট ছোট এত দেও গজিয়েছে যে, সব পছন্দ-অপছন্দের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ান কঠিন হয়ে উঠেছে দিনে দিন। কাল রাতে পেটে খিদে নিয়েই শুতে যেতে হয়েছিল আমাকে। খাবার দেবার সময় কে মেয়েছেলে বেরালের নাম করেছিল। শিকারের তুকতাক নষ্ট হয়ে যায় ওই নামে। তাই উপোস করে রইলাম।'

জ্ঞাতির কথাগুলোর শেষের দিকে তেমন মন দেয় নি ওপোকু। এবার ও উঠে পড়ে, সংক্ষেপে দু কথায় থামিয়ে দেয় তাকে ঃ

'বেশ ত, একটা মোরগ বলি দিয়ে ঠাণ্ডা কর্। আমাকে এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে। সন্ধ্যের পর বাবার কাছে যাব, নাচ শুরু হবার আগে বংশের গোপন কথা কিছু বাৎলে দেবে বাপ্।'

দুজনে উঠে পড়ে। শরবনের মাঝখানে হিপো চলার পথ ধরে উঁচুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, বনের ভিতর ঢুকবার একটা পথ পেয়ে যায়। দুজনেই নীরব। ওপোকু আগে আগে পথ দেখিয়ে চলে। হঠাৎ তার সঙ্গী 'কিছু মূলো যোগাড় করে আনি' বলে পিছন ফিরে চলে যায়।

ওপোকু চলে একাকী। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে চোখ দুটো আপনা থেকেই পথের উপর নিশানা খোঁজ করতে থাকে, কোন শিকার এ পথ পার হয়েছে কি না। হঠাৎ থেমে যায় ওপোকু। একটা গাছ থেকে ডাল ভেঙ্গে পথের ধারে স্তূপীকৃত শুকনো কাঠকুটোর মধ্যে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সমাজের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে এক যুগল এখানে খোলা মাটির উপর মিলিত হয়েছিল। সেই অবস্থায় ধরা পড়ে তারা চিরদিনের জন্য ধিকৃত হয়েছে, সেই ধিক্কারকে বাঁচিয়ে রাখে এই লাকড়ির স্তূপ।

'দেবী-বসুমতী এই মিলনের মজাটা যোলআনাই ভোগ করে,' আপন মনে জোরে জোরেই বলে ওপোকু। 'যতদিন পথের ধারের এই নিশানাটা

থাকবে, ততদিন ওদের হুষবে লোকে। ভাল মাদুর চাটাই ত একশো কড়িতেই একটা পাওয়া যায়। তবু মরদ ও মেয়েগুলি এমন আহাম্মক যে বসুমতীর খোলা গায়ের উপরই শুয়ে পড়ে।

আপনা-আপনিই হেসে ওঠে ওপোকু, কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। এই কাঠ কুটোর স্তূপটা তাকে শুধু সাবধান করেই দিচ্ছে না, এটা একটা ভাবী বিপদেরও ইশারা।

পথ ধরে এগিয়ে চলে ওপোকু, কিন্তু একটু গিয়েই আবার থেমে দাঁড়ায়, হঠাৎ যেন কোন অদৃশ্য বাধা পথ রোধ করেছে সামনে। সরু পথের এপাশ ওপাশ জুড়ে পড়ে আছে একটা টাটকা ভাঙা ডাল। ওপোকু একবার ডাইনে, তারপর বাঁয়ে তাকায়। চোখে পড়ে মাঝখানে ভাঙা লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটি পথের উপর নুয়ে পড়ে আছে। সদ্য ভাঙা অংশ থেকে এখনও গড়িয়ে পড়ছে রস। এপাশ ওপাশ তাকাতে ওর চোখে পড়ে ওই রকম আরও একটা, আরও একটা। অমনি মাঝখানে ভাঙা ডাঁটিগুলো যেন ওকে ইশারা করে। সেই ইশারায়ই সঙ্গে সঙ্গে ও ঝোপের ভিতর পথ পেয়ে যায়, কোন অসুবিধা বোধ করে না।

সে পথ ওকে নিয়ে যায় একটা ফাঁকা মাঠে, মাঝখানে একটা জলাশয়, ঝোপে ঝাড়ে ও গাছে এ জায়গাটা পথ থেকে একেবারেই আড়াল করা।

মুখ তুলে তাকায় রূপসী। জলের ধারে শেওলা ও ঝরাপাতার উপর উপুড় হয়ে সে শুয়ে আছে। তার লম্বা পা দুটো পিছন দিকে সটান ছড়ানো। কনুই দুটো মাটিতে ঠেসে মাথাটা একটু উঁচু করে দু হাতের পাতায় চেপে ধরেছে দু গাল। তার লাবণ্যভরা দেহের রেখাগুলো দর্দম হয়ে উঠেছে এই ভঙ্গীতে।

'বেশ, বেশ ; জিরোচ্ছিস ? যে জলার খাদে চিতারা জলখেতে আসে, চিতা জাতের সর্দারের মেয়ের জিরোবার সেটাই জায়গা।'

'আর চিতাজাতের সর্দারের ছেলেরই বুঝি নয়—বিশেষ বনের মনের কথা যে বুঝতে পারে!' বলেই আমালাগানে হেসে ওঠে। মনের খুশী উছলে পড়ে হাসিতে।

ওপোকু বসে পড়ে ওর পাশে। হাঁটুটা মুড়ে দিতে প্রায় থুতনি পর্যন্ত এসে পড়ে তা।

কারুর মুখে কথা নেই, একেবারে নীরব।

পিঠ বাঁকা ও পেট মোটা জলের পোকাগুলো জলের উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলে। একটা সরু ল্যাজওয়ালা প্রজাপতি লালচে অর্কিডটার পাঁপড়িতে বসে অলস ভাবে ডানা দুটো খোলে আর বন্ধ করে। তারপর হাওয়ায় ভেসে গিয়ে বসে ময়লার উপর। কতকগুলো কাঁচ পোকা এপাশে ওপাশে উড়ে বেড়ায়। কখনও জলের উপর পাক খেতে থাকে; পাখনা নড়ে না একটুও, শুধু সবুজ, নীল ও সোনালী রংগুলো থেকে থেকে চক্ চক্ করে ওঠে।

মাথার উপরে ঘন গাছ। তারই পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ে ওদের অনাবৃত দেহে। আলো-ছায়ার খেলায় দেহের মধ্যে কেমন যেন চিতাবাঘের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই চিতাবাঘ থেকেই ওদের গোষ্ঠীর নামকরণ।

'খবরটা শুনেছিস্?' প্রশ্ন করে আমালাগানে, তার সলাজ প্রশ্নের মধ্যেও প্রশংসার প্রত্যাশা।

'হাঁ শুনেছি,' কিছুটা সংক্ষেপেই জবাব করে ওপোকু।

'উপায় ছিল না,' বলে রূপসী, কিছুটা কৈফিয়তের ভাব তার কথায়। 'তোর জন্যেই আমাকে তা করতে হল, নইলে বুড়ী বলে ফেলত।'

'কারণটা কেউ কোনমতে অনুমান করতে পারে নি ত?' ওপোকু প্রশ্ন করে। তারপর বলে চলে:

'আজ রাতে নাচিয়েরা তোকেই তারিফ করবে ; চেঁচিয়ে বলবে, তোর মত মেয়েরাই শিকারী ও লড়িয়েদের মা হতে পারে। তোর তারিফ করতে গিয়ে ওরা ভুলে যাবে বুড়ীর কেলেঙ্কারির কথা, গাইবে—'

বলেই সুর জুড়ে দেয় ওপোকু :

"লাথি মেরে বুড়ী দিদির পাছায়
দিল তারে ঝাঁপ দিইয়ে সব চাইতে দূরের কুমীরটায়।"

উৎকট পাশব হাসি হেসে ওঠে ওপোকু। কিন্তু হঠাৎ মুখের উপর একটা ঘুঁষি লাগতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সব কিছু ভুলে যায়। খুন করার বাসনা ছাড়া আর সব অনুভূতি লোপ পেয়ে যায় ওর। গলাটিপে খুন করতে যায় রূপসীকে।

কৃতকর্মের সাজা কি হতে পারে, তা পুরোপুরি অনুমান করেও আমালাগানে কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার এতটুকু চেষ্টা করে না। মনের সব রাগটুকু ঘুষিতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা উৎকট প্রত্যাশা নিয়েই ও আক্রমণের প্রতীক্ষা করে। প্রত্যাশার স্বরূপটা কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগে, কিন্তু ভয় বা আশঙ্কার ভাব নেই তার মধ্যে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে রূপসী :

'ওপোকু, রক্ত পড়ছে মাটিতে, শীগগির জলে ধুয়ে রক্ত বন্ধ করে আয়।'

সত্যি ওপোকুর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, টপ্ টপ্ করে পড়ছে পায়ের কাছে ঝরা পাতাগুলোর উপর। মাটি-মায়ের বুকে জ্ঞাতির রক্তপাত, সে যে মহাপাপ! ভাবতে ভয়ে আঁৎকে ওঠে রূপসী।

ওপোকুও ভয় পায় ভীষণ। মনের অবস্থা চট্ করে সামলে নেয়। জলার ধারে এসে মাথাটা নিচু করে সারা মুখে ঝাপটা দিতে থাকে।

রক্ত বন্ধ হতেই সম্বিৎ ফিরে আসে ওপোকুর। সোজা হয়ে উঠে বলে, 'তীরগুলোর তেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিষ্টি পড়ছে না ; জ্ঞাতির রক্তপাত—তাও ঘটল আর একবার !'

আমালাগানে তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দেয়, ওপোকুর কথা কানে যাবে বলে নয়, পাছে আড়ি পাতা কোন দানো শুনে ফেলে কথাগুলো।

ওপোকু ফিরে তাকায় রূপসীর দিকে। কয়েক মিনিট আগে যাকে খুন করবার বাসনা জেগেছিল মনে, হঠাৎ তাকে বাহু বন্ধনে বাঁধবার তীব্র কামনা জেগে ওঠে। কিন্তু ভয় হয়, সঙ্কোচও হয় কিছুটা।

আমালাগানে ওর মনের কথা বুঝতে পারে। দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নতুন আক্রমণের প্রত্যাশায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকাতে থাকে, আমন্ত্রণের ইশারা তার দৃষ্টিতে।

ওপোকুর মতন কোন শঙ্কা বোধ করে না রূপসী, কোন সঙ্কোচ জাগে না তার মনে। এর আগে যে তীব্র পুলক বোধ করেছে, এখনও তেমনি মনে হয় ; কেন হয় তা কিন্তু ও বুঝতে পারে না। আগে ছিল মৃত্যুর আশঙ্কা, এখন প্রত্যাশা করছে প্রেমের পীড়ন।

হঠাৎ ওপোকুর মনে পড়ে যায় সেই কাঠকুঠোর স্তূপের কথা। একটু আগেই সেও তাতে একটা গাছের ডাল দিয়ে এসেছে। ক্ষণিকের ভুলের জন্য আর একটা ওই রকম স্মৃতিস্তম্ভ সে খাড়া করবে, একথা ভাবতেও তারভয় হয়। শিউরে ওঠে।

'আমাকে এখুনি যেতে হবে' বলে ওপোকু। 'আমার পিছন পিছন চলে আয়, তবে একটু পরে। স্যিয্যি ডুবে যাওয়ার পর আর এখানে থাকিস্ না। কাল রাতে সিঙ্গি ঘোরাফেরা করেছে।'

হতাশ হয়ে যায় রূপসী।

ওপোকু আশ্বাস দেয়, 'নাচের আসরে আবার দেখা হবে।'

শেষ আশ্বাসটুকুতে রূপসী তৃপ্ত হয় না, যদিও আশ্বাসের গূঢ় ইঙ্গিতটুকু অনুমান করতে অসুবিধা হয় না তার। মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারে না। জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, 'সিঙ্গিকে আমি ডরাই না, ভীরু জানোয়ার ওগুলো! ছুঁচলো দাঁতওয়ালা বরার বরং তার চেয়ে সাহস বেশী।'

পিছন ফিরে হন্ হন্ করে চলে যায় ওপোকু। ঝোপের মধ্যে ঢুকবার আগে ফিরে তাকায় আর একবার।

'সাবধানে আসিস রূপসি'। ভুত-প্রেত-দানো সিঙ্গির চেয়ে ভয়ানক, গোঁয়ার বরাগুলোর চেয়েও। আমার চেয়েও তাদের সাহস বেশী। আজ রাতে তাদের মধ্যে অজানা কতকগুলো দল থাকবে।'

বিরক্তির সঙ্গে ফিরে যায় আমালাগানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর বড় বড় চোখ দুটোতে ফুটে ওঠে ভীতি। চারপাশে শিকারীর দল ঘিরে ধরে কাছে এগিয়ে আসতে থাকলে হরিণের চোখে যেমন ভয় জাগে, তেমনি। মনে নে বলে, 'ওকে ঘেন্না করি, খুনও করে ফেলতে পারি।'

কিন্তু ওপোকু পথ ধরবার আগেই কান্নায় ফেটে পড়ে রূপসী মেয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

নৃত্যোৎসবের রাত। হ্রদের জলে কুমীরের মুখে ঠেলে ফেলায় পরলোকে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সেদিন যারা মিলিত হয়েছে, আসলে তাদেরই শোকানুষ্ঠান এটা।

তরুণ দলের কাছ কিন্তু এই সব গাম্ভীর্য ভরা উপলক্ষ্য ছাপিয়ে উঠেছে উৎসব ও আনন্দের সম্ভাবনা, নাচ ও পচাই খাওয়ার মওকা। তাছাড়া এই সুযোগে প্রেমলীলার অবকাশও যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

সারা বিকেল ধরে আশপাশের গোষ্ঠী-পল্লী থেকে নানা দিকের পথে কাতারে কাতারে ভিনগাঁয়ের লোক আসতে থাকে এদিকে। বনের মধ্যে অবস্থিত যে গ্রামে অনেকগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুরোহিত ও সর্দার-ভূস্বামীর বাড়ী, চারিদিক থেকে পথ এসে মিশেছে সেখানে।

ওপোকু ও আমালাগানের কাছে এই দিনটার গুরুত্ব দু-তরফা। সাঁঝের বেলায়, নাচের আগে ওদের দুজনই দীক্ষা লাভ করবে। তাদের বংশের নিজস্ব যে সব গোষ্ঠীগত রহস্য আছে, তার গোপন খবর সে দিন জানানো হবে তাদের। দুজনেই অতীত জীবনকে চিরদিনের মত পিছনে ফেলে আসবে এই দিনটিতে। পিছনে পড়ে থাকবে শৈশব কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের দিনগুলো। যৌবনের পূর্ণ অধিকারে প্রবেশ করবে ওরা। কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের পুরোপুরি সদস্য আর সবার মত দায়িত্ব, এমন কি, বাধা-বন্ধগুলিও সবটুকু সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

অবস্থার এই পরিবর্তনের আগে কিছুদিন জোর করে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রথা নেই এই বংশে, নেই দীক্ষার দীর্ঘ ক্রিয়াকাণ্ড কিছু। ওপোকু ও আমালাগানে যে সংস্কার লাভ করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে কঠোর ব্রত-নিয়মও কিছু নেই। সম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন

বর্ষীয়ান বা বর্ষীয়সী কিছু ভাষণ দেবে শুধু। মেয়েটির পক্ষে অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটি নারীত্বসুলভ ত্বকচ্ছেদই ভূমিকা, উপদেশ দানের দিনকয়েক পরেই হবে ত্বকচ্ছেদ অনুষ্ঠান। যুবকের পক্ষে আর কোন কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

ওপোকু বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়তে পরিচিত অনেকে তাকে অভিবাদন জানায়। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হয়েছে স্থানীয় বাজারে, কি বৃহৎ উৎসবে, কিংবা শিকারের দলে। যে ভাবে একই গোষ্ঠীর পরিবারগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে নিঃসম্পর্কে বসবাস করে, তাতে ওই সব মিলন-কেন্দ্রগুলি ছাড়া তাদের মধ্যে দেখাশুনা জানা-পরিচয়ের কোন সুযোগই হয় না।

গ্রামে ঢুকেই ওপোকু দেখে বাজিয়েরা তাদের আসর সাজিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ এরই মধ্যে বেসুরো বাত্তি বাজিয়ে নিচ্ছে এক আধটু। কেউ কেউ বা সুর বেঁধে নিচ্ছে যন্ত্রগুলিতে। সুর বাঁধবার জন্য নাকাড়া-বাজিয়েরা খড়ের আগুনের উপর নাকাড়ার চামড়া ঢাকা অংশটা নেড়ে চেড়ে সেঁকে নেয়। ঘরের চালের বাতা থেকে টেনে নামিয়ে সেই খড়ে জ্বালিয়েছে আগুন। আর একদল বাজিয়ে তাদের যন্ত্রের ছোট গোল গর্তের আবরণগুলো মেরামত করে নেয় এই ফাঁকে। বাজনার খোলগুলি বড় থেকে ছোট হয়ে কাঠের পটির সঙ্গে ঝুলতে থাকে। আর তার উপরে থাকে সেই গোল গর্তগুলি। কাঠের পটিগুলিই চাবির কাজ কাজ করে। মেটে দেয়ালের গায়ে মাদী মাকড়শা ডিম পাড়লে তার উপর যে চামড়ার মত পাতলা মসৃণ একটা আবরণ বিছানো থাকে, তাই দিয়েই ওই বাজনার খেলের গর্তগুলি ঢাকা দেওয়া হয়। আফ্রিকার পিয়ানো এই সুরেলা যন্ত্র যে ঝম্ ঝম্ গুন্ গুন্ সুরের জন্য পরিচিত, খোলের উপকার ওই আবরণই তার প্রধান উৎস।

নানা বয়সী মেয়েরা দীর্ঘ সারি বেঁধে জল নিয়ে আসে। কালো মাটির হাঁড়িগুলি সুন্দর ভাবে মাথায় বসিয়ে পথ চলে। এদের মধ্যে আছে সরলচোখ পেটফোলা ছোট ছোট মেয়ে। আছে নিটোলস্তনী লাবণ্যময়ী কুমারীর দল। দুদিনের যৌবনমদে আত্মপ্রসাদে ভরপুর হয়ে সগর্ব পদক্ষেপে পথ চলে তারা। ঠাকুরমা দিদিমারাও আছে। তাদের ঝুলেপড়া স্তন দুটো পা ফেলার তালে তালে কখনও ঝল্ ঝল্ করে, কখনও লট্‌পট্ করে বুকের সঙ্গে, মাঝে মাঝে কখনও বা দোল খায়। হাঁড়িগুলোর মধ্যে সবাই কয়েক গোছা করে পাতা ভরে নিয়েছে। নইলে চলার সঙ্গে সঙ্গে জল চলকে পড়বে যে।

আর একদল মেয়ে গাঁয়ে ধান ভানতে ব্যস্ত। তারা সবাই একসঙ্গে কথা কইছে, কথার সুরে উত্তেজনা। হামানদিস্তাগুলোতেও যেন উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগে গেছে। ঘন ঘন পাড়গুলো যেন কুটোনিদের মনের উল্লাসেরই প্রতিধ্বনি। খাসা পিঠে তৈরী হবে তারই খবর বলছে বোধ হয়।

এত অচেনা লোক দেখে আর তাদের গন্ধ পেয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। দু পা এগিয়ে অন্ধকার দরজার কাছে পিছিয়ে আসে। রোগা হাড় জিরজিরে গরু-মোষগুলোকে গ্রামের গোয়ালের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ছোট ছোট ছেলেরা। রাখাল ছেলেদের কাঁধে এক একটা ছোট কুড়োল। মাঠে চরার সময় গরু মোষগুলোকে সিংহ, চিতাবাঘ কিংবা হায়েনা আক্রমণ করতে পারে, তারই জন্য এই হাতিয়ার।

গাঁয়ের সমগ্র পরিবেশ আনন্দের প্রত্যাশায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে। রাত আসতে দেরি নেই। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশের ঘোলাটে আলোয় সাহারার গরম হাওয়া 'হারমাটান'-এর আগমনী ঘোষিত। ঝিঁঝির দল বিকট কট কট জুড়ে দিয়েছে। সারা রাত চলবে সে শব্দ। একদল বাদুড় এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়ে পরিপাটি করে পাতায় ছাওয়া চালের উপর ছোঁ মেরে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

অগণিত দৃশ্য ও শব্দের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে চলে ওপোকু। ক্রমে সে এসে নিজের কুটীরের সামনে হাজির হয়। অনেকগুলি কুটীর নিয়ে তাদের বাড়ী। ওর বাপই সে বাড়ীর কর্তা, গাঁয়ের একজন মোড়লও বটে।

বাড়ীর উঠোনে ছোট-বড় নানা মাপের কয়েকটা তেকোনা ঢিপি খাড়া হয়ে আছে। প্রত্যেকটার ভিতের কাছে একটা করে গর্ত্ত। সব ক'টার গায়েই বেয়ে নেমেছে শুকনো রক্তের দাগ। ইদানীং যেসব মোরগ বলি হয়েছে তার পালক আটকে আছে কোন কোন ঢিপির গায়ে। বংশের মৃত পুরুষদের আত্মার মন্দির এগুলি। গর্তগুলি দিয়েই আত্মারা মন্দিরে ঢোকে ও বার হয়।

আর একটা নিচু গোলাকার ঢিপির উপরে কতকগুলি উলঙ্গ শিশু হাত পা ছুঁড়ে আনন্দে খেলা করছে। এই জায়গাটা হল আকাশ-দেবতা বা পরমেশ্বরের বেদী। এর তলার দিকে যা হেলান দেওয়া রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়, এককালে এটা ছিল বিরাট একটা হাতীর চোয়াল। নানা জাতের হরিণের খুলি এবং শিংও রয়েছে এখানে। ধনুকবাণ দিয়ে যে কোন জানোয়ার শিকার করা হবে, তার কিছু অংশ দান করতেই হবে এই মন্দিরে।

চতুর্থ অধ্যায়

হামা দিয়ে কুটীরের ভিতর ঢুকে আসে ওপোকু। একজন বর্ষীয়ান পুরুষ মেঝের উপর লেটিয়ে বসে আছে। তার বাঁ কাঁধ থেকে একটা ছাগলের চামড়ার উত্তরীয় ঝুলছে। সামনে একটা পাত্রভরা শিকড়সিদ্ধ জল। ঠিক সেই সময় তারই উপর একটা মোরগ বলি দেওয়া হয়েছে, ওর পায়ের কাছে পড়ে তখনও ঠ্যাং ছুঁড়ছে মরা পাখীটা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সেটা, হলদে ঠ্যাং দুটো উপরের দিকে তুলে। দেবতা যে বলি গ্রহণ করেছে, এই তার প্রমাণ।

'আসতে দেরি করেছিস বাপ,' ওপোকু সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ তাকে সম্বোধন করে।

'চাঁদ এখনো ওঠেনি বাবা,' বলে ওপোকু, 'ঝরনার নিচেকার জলায় মাছের পলোগুলি দেখতে গিয়েছিলাম।' দেয়ালে পোঁতা কাঠের গজালটার দিকে এগিয়ে যায় ওপোকু, ধনুকটা ঝুলিয়ে রাখে সেখানে, হাত গলিয়ে খুলে ফেলে তূণটা।

'তোর তূণে টাটকা রক্ত; তুই যে জলায় গিয়েছিলি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কিছু মেরেছিস নাকি?'

রক্তের দাগ যে সব খবর বলে দেবে! তাছাড়া, গোড়ালির উপর সবুজ কাদার একটা ক্ষীণ রেখাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসাবধানতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয় ওপোকু।

'না বাবা, একটা ছোট গাছ সরিয়ে যাবার সময় ছিটকে এসে তা মুখে লাগে। তাতেই রক্ত পড়েছে নাক থেকে।'

'বোস্ ব্যাটা, বোস্। টুলটা টেনে আন্ আমার কাছে।'

ওপোকু হুকুম তামিল করে। তার বাপ উঠে দাঁড়ায় দরজার উপরে

গুটিয়ে রাখা মাদুরটা সযত্নে নামিয়ে নেয়। আবার বসে পড়ে। শুকনো তরমুজের খোলার ছোট একটা বাটী তুলে নিয়ে জলের পাত্রের মধ্যে ডোবায়। তারপর জল তুলে চুমুক দেয়, সঙ্গে সঙ্গেই বার করে দেয় মুখ দিয়ে, পিচকিরির মত ছিটে যায় জল। তারপর বৃদ্ধ বলে, 'কুম্ কুম্ কুম্। এই আমার ছেলে, ওর সামনের দিকে চুল গজিয়েছে, ওকে এখন সব বলতে পারি।'

একটু অপেক্ষা করে মোড়ল, যেন জবাবের প্রত্যাশায়। ওপোকুর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দেয়। প্রবীণ বলে চলে:

'বেটা, তুই এখন সেয়ানা হয়েছিস। বংশের গোপন বিষয় তোকে এখনি বলা হবে। কিরে কর্ যে, আমি তোকে যা বলতে যাচ্ছি, তা কখন কাউকে বলবি না।'

'কোন্ দেবতার কিরে বাবা?'

'দেবতার কিরে নয়। যার থেকে আমাদের বংশের নাম, কালো কালো ছোপ যার গায়ে, ঝোপ ঝাড় যে কাঁপিয়ে দেয়, সেই চিতাবাঘ কুরোত্বামনসা-র কিরে।'

'কিরে করছি,' বলে ওপোকু, শপথ স্বীকারের ভঙ্গিতে ডান হাতটা উঁচু করে তোলে।

'ব্যাপারটা এমনি হয়েছিল বাপ:

'অনেক—অনেকদিন আগে—এত আগে যে, কালো পাথুরে লোহা, যা দিয়ে আমরা তীরের ফলা বানাই, তা পেটাতে জানতাম না আমরা। মাটি খুঁড়তে মাঝে মাঝে যে পাথর পাস, যাকে বলিস আকাশ-দেবতার বাজ, তাকে ভেঙে ঘষেই লোকে কুড়োল বানাতো। সেই সময় একদিন আমাদের পূর্বপুরুষ বুনো মধুর খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়রান হয়ে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

'কাছের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে একটা কালো মাম্বা, বাচ্চাও ছিল সে গর্তে। মাম্বাটা ঘুমন্ত লোকটাকে কাম্‌ড়েই দিত। কিন্তু একটা চিতাবাঘ তার খোলসটা ধরে টেনে সরিয়ে দিলে। আমাদের পূর্বপুরুষ জানতেও পারেনি, কি বিপদ থেকে সে বেঁচে গিয়েছে। ঘুম ভাঙতেই কিন্তু কুড়োলটা নিয়ে চিতাবাঘটাকে মারতে গেল সে। বাঘ কথা কয়ে উঠল :

'ছেলে কখনো নিজের বাপকে খুন করে না। চিতাবাঘের বংশে তোর জনম। তুই বাড়ী যা। তুই বা তোর বংশের কোন পুরুষ যেন আর কোন দিন চিতাবাঘের গায়ে হাত না তোলে। চিতাবাঘেরা সব তোর জ্ঞাতি। তাদের তুই মেনে চলবি। শুধু তুই নস্‌, তুই, তোর ছেলে, তার ছেলে—এই ভাবে চিরদিন। এই যে রক্তের টান, চিরকাল তা শক্ত হয়ে থাকবে। ওই রক্তের সম্পর্ক তোর মা ছাড়া আর কারু মারফতে বাড়তে পাবে না। এরই জোরে তোর থেকে যত পুরুষ জন্মাবে, সবাই হবে ভাই ভাই ; আর মেয়েরা হবে তাদের বোন।

"জ্ঞাতির মধ্যে সম্পর্কের নিয়মও তাই—আমি বলে দিচ্ছি। তুই জানিস যে পেট থেকে পেটে একসূতোয় যাদের নাভির নাড়ী বাঁধা, এমন মেয়ে মরদ কখনও মিলতে পারে না। চিতাবাঘের সম্পর্কও সেই ভাবেই মেনে চলবি।

"চিতাবাঘের বংশের কোন পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে কখনও কোন মতেই মিলন হবে না। যেখানে সূয্যি ওঠে, যদি তাদের একজন আসে সেই সুদূর পূব দেশ থেকে, আর একজন আসে সেই পশ্চিম থেকে, সূয্যি যেখানে ডুবে যায়, তবুও না। তারা যে সবাই ভাই আর বোন।

আরো জেনে রাখ্‌ এই নিয়ম যারা মেনে চলবে, মরার পর চিতাবাঘ হয়ে উঠে আসবে তারা। বেঁচে থেকে তারা যে বনে শিকার করে

বেড়িয়েছে, সেখানেই তারা ঘোরাফেরা করবে। যেখানে এককালে পিয়াস মিটিয়েছে, সেই সব জলাতেই তারা জল খাবে। নতুন রূপ নিয়ে আসবে তাদের দেহ। আত্মা অদৃশ্য ভাবে মৃতের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। আমাদের বিরক্ত করিস না, আমরাও তোদের পাশ কাটিয়ে চলে যাব। তোদের ভাই নয়, এমন কেউ যখন আমাদের খুন করতে আসবে, তাদের হাত টেনে ধরবি তোরা। আমাদের জখম হতে দেখলে যতন করবি। আমরা মরলে গোর দিবি। আর আয়ু ফুরোবার আগে তোদের আপনার জন কেউ মরলে, তার জন্য যেভাবে শোক করিস, তেমনি শোক করবি আমাদের জন্যও। এই নিয়ম যদি না মানিস, বিষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, জমিতে বীজ মরবে শুকিয়ে, শিকারীর শিকার পালিয়ে যাবে, তোদের বৌয়েরা হয়ে যাবে বাঁজা। তোদের ছেলেমেয়ের গোড়াই যাবে মরে।'

'এই সব কথা আমাদের পূর্বপুরুষকে বলেছিল সেই চিতাবাঘ।' বৃদ্ধ থামে। হাতের পিছনটা কপালের এপাশ ওপাশ টেনে নিয়ে আঙুল থেকে ঘাম ঝেরে ফেলে ওপোকু। বুড়ো বলে চলেঃ

'বেটা, আমার যখন সময় হবে, মনের ফুর্তিতেই ঝাঁপ দেব জলে। আবার সেই রাতেই ফিরে আসব আমি, উঠানের আশে পাশে ঘুরে বেড়াব। যখন দেখব তুই ঘুমোসনি, আমি বলব, 'ও, কি ভালো ছেলে আমার!'

'এই যে গোপন কথা তোর কাছে বললাম, কারু কাছে তুই তা ফাঁস করবি না। এমন কি, কোন দিন যখন বৌ নিয়ে চাটাইয়ে শুয়ে গল্প করবি, তখনও নয়। তাকে কখনও বলবি না এসব কথা। সে যদি মিনতি করে, যৌবনভরা দেহ দিয়ে তোকে ফুস্‌লোয়, তবুও না। নিজের বেটীকেও বলবি না কখনো। একদিন সে তোর ঘর-গেরস্থালি ছেড়ে বউ হয়ে অন্য বাড়ী চলে যাবে। সে যদি জানে এ বংশের গোপন কথা, হয়ত তার মরদের

কাছে বলে দেবে। তখন যদি সে তোর সঙ্গে ঝগড়া করে, গালাগালি দিয়ে তোকে বলে 'চিতাবাঘের জন্ম,' হয় তুই তাকে খুন করবি, আর নয় সে খুন করবে তোকে। তোর বেটাকে তুই বলবি একদিন, যখন সে তোর মত সেয়ানা হবে।

'আরও ব্যাপার আছে, যা তোর জানা উচিত। আকাশের দেবতার কথা কিছু বলার আমার দরকার নেই। বচন আছে জানিস, 'ঈশ্বরের কথা শিশুকেও কেউ শোনায় না।' মোরগটা পর্যন্ত ভাঙা সানকি থেকে জল খেতে খেতে তার দিকে মাথা তুলে তাকায়। তার স্ত্রী দেবী-বসুমতীর পূজো তুই ছেলেবেলা থেকেই শিখেছিস। আমার আর সর্দারের পিছন পিছন নতুন ফসল ওঠার সময় তার পূজো দিতে কুঞ্জে গিয়েছিস তখন।

'বীজ আর ফসল জন্মানোর গোপন কথাও বলছি শোন্। আকাশ-দেবতা দেবী-বসুমতীর গর্ভের বীজে রস ঢালে, তারপর বীজ পাকে ও গ্যাঁজ বেরোয়।

'তুই জানিস খোলা মাটিতে কোন মেয়ের সঙ্গে শোয়া একেবারেই বারণ, নিজের বউয়ের সঙ্গেও নয়। তার যা শাস্তি—সব লোকের অবিরাম টিটকারি চিরদিন ধরে—সে ত বেঁচে থেকেও মরণের বাড়া। এই অবস্থায় অনেকে নিজের উরুতে নিজেই বাণ ফুটিয়ে মরেছে।

'বেটা, তুই হলি শিকারী। তোকে আমার বলা দরকার যে, কতকগুলি জানোয়ার আছে—তারা যে সব সময় ভীষণ বা হিংস্র তা নয়, কিন্তু তাদের আত্মা মরবার পরও শয়তানি করে। তাদের তুষ্ট করে চলতেই হবে, নইলে পাগল হয়ে যাবি। কথা আছে জানিস্, শিকারীর মত পাগল।

'বিষবাণের গোপন খবরটাও তোর জানা উচিত। এও একটা দেবতার আটন। সে আটনের সেবায়েত থাকে এমন কুমারী মেয়ে যার

ছেদন হয়নি, পুরুষ কি তাও যে জানে না। সেই কন্যেকে বলি বাঘিনী কন্যে। এখনকার কন্যে হল আমালাগানে।

'নদী, পাহাড় আর কতকগুলি গাছের আত্মা তুই জানতে শিখেছিস। তারা ভারী তেজী, আর দুশমন শয়তান। কিন্তু যারা জানে, তারা ওদের দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারে।

'ডাইনিদের খবর আমি বিশেষ জানি না, শুধু জানি যে তারা অগুণতি। আমার মায়ের দিকে একজনও ডাইনি হয় নি, তাই আমাতে তার ছোঁয়া লাগেনি। মেয়েদের ভিতর দিয়েই তা বেটাতে বর্তায় কি-না। তোর মায়ের কথা? তার সেদিকে মন আছে কি-না, তা সে-ই বলতে পারে।

'যে গুষ্টিতে তুই এখন এসে গেলি, তার সম্বন্ধে আরও কিছু তোকে জানতে হবে। আমাদের নিজেদের নিয়ে সে গুষ্টির সাতটা ধারা। এদের ছটির মধ্যে তুই বউ খুঁজতে পারিস, কিন্তু তাও সব মেয়ের মধ্যে নয়। নাভির নাড়ী দিয়ে তোর বংশের সঙ্গে যার যোগ আছে, তার দিকে, খবরদার, তাকাবি না।

'তোর মামা,' খানিকটা থুথু ফেলে বুড়ো, তারপর বলে চলে, 'সে তোকে বেটা বলে। তার বাধাবন্ধের নিয়ম ভাঙা তোর উচিত নয়। তোর জন্য বউ আনতে যে গরু-মোষ দিতে হবে, আমি যদি কখনও অভাবে পড়ি, তাহলে তার দামও হয় ত সে দিতে পারে। এটা পুরানো রেওয়াজ। লোকে বলে, যে যুগে ছেলেদের ওপর বাপের কত্তিত্ব খাটত না, সেই যুগে মনের মত ছেলের অভাবে বোনের ছেলেকেই লোকে নিজের ছেলের মত মানুষ করত। সেই যুগ থেকে এই রেওয়াজটা এসেছে।

'মামাগুলো সব তেড়িয়া কুত্তা! তোর মামাও আর পাঁচ জনের থেকে ভালো নয়। তবে তাদের দিয়েও কাজ হয়। তার মোরগ ও অন্য চিড়িয়া তুই

নিয়ে নিতে পারিস, তাতে চুরির দায়ে পড়বি না ! তবে তার ছেরাদ্দে একটা ছাগলও তুই দিতে পারিস।

'আমাদের এ গুষ্টির শাসন কি করে হয় তা জানিস বেটা ? বাপ তার পরিবার শাসন করে ; একটা বংশের পরিবারগুলোর উপর তদারকী করে বংশের মধ্যে সব চেয়ে যে বয়সে বড়। অন্যান্য বাড়ীর বয়সে ছোট কত্তারা দরকার হলে তার সঙ্গে শলা করে। আর, সব দলের মধ্যে যে বুড়ো সেই সব দলের মাথা। মেয়েদের উপর বাড়ীর কত্তার কোন কত্তিত্ব নেই। কারণ তারা হল অন্য বংশের, এতটুকু অপছন্দ কিছু ঘটলেই মার কাছে ছুটে পালায়। শাউড়ী ঠাকরুণ সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকবি সব সময়।

'সব বংশের উপর-আলা হল, যার নাম সর্দার। যতক্ষণ পরিবারের বাইরে কারুর গায়ে ছোঁয়া না লাগে, ততক্ষণ পরিবারের ব্যাপারে, পরিবারের পূজা-আচ্চায়, পরিবারের ঝগড়ায় বা পরিবারের কাজে কম্মে নাক গলানোর তার কোন অধিকার নেই, আর তা করবেও না সে কখনও। আমাদের সব জমিজমারও সে-ই হল জিম্মাদার, তা রক্ষে করা তার দায়। সে-ই দেখবে গুষ্টির জমি কেউ বেচে না দেয়, বা তা নিয়ে কোন লেনদেন না করে। কেউ নোংরা না করে দেয় জমি তাও সে দেখবে। কেউ যদি জমি নোংরা করে, তবে তা শুদ্ধু করবেও সে। এবং দোষীকে সাজাও সে-ই দেবে।

'পরিবারিক ব্যাপারে তখনই সে মাথা গলাবে, যখন পরিবারের কেউ এমন পাপ করে, যার শাস্তি দেবতারা শুধু পাপীকেই দেয় না, সারা সমাজের উপর ছড়িয়ে দেয়। রক্তের বাধানিষেধ এড়ান এই ধরনের পাপ। ভগবানের সঙ্গে কথা বলে সর্দার, যেমন আমি বলি আমার বাপের সঙ্গে, আর তুই আমার বেটা, আমার সঙ্গে কথা বলবি একদিন। খেয়াল রাখবি,

আমি যেন আমার বলির ভাগ ঠিক মত পাই, নইলে তোকে ডাণ্ডা পেটার ইচ্ছে হবে আমার।

'বিষম একটা কিছু হতে যাচ্ছে বুঝলে পরিবারের কর্তা, বংশের কর্তা, গ্রামের মোড়ল—সবাই জমায়েত হয়। সেখানে সকলকার ওপরে থাকে সর্দার। সব কিছু শুনে আমাদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে সে দেবতাদের কাছে ব্যাপারটা পেশ করে। দেবতারা বিচার করে রায় দেয়।

'মানুষে মানুষে সম্পর্কের কথা যা তোকে বলেছি, তা বড় কঠিন মনে হতে পারে। যার সঙ্গে মিলনে মানা আছে, তার প্রতি লালচে তোর গলা ফুলে উঠলেও, সে লালচ মেটাতে পারবি না তুই বেটা!'

নিশ্চল হয়ে বসেছিল ওপোকু, নিজের সমগ্র সত্তাকে পরম আয়াসে সংযত করে। সমস্ত শিরা ও স্নায়ুগুলি তার এক মুহূর্তের জন্য শিউরে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার স্থির করে নেয় নিজেকে।

বৃদ্ধ বলেই চলেঃ 'একথা জানলে তোর মনে আর কোন দুঃখ থাকবে না যে, তোর বেলায় যা মানা, বড়দের বেলায়ও তাই। যারা আমার মেয়ের মত, এ বংশে তাদের কাউকে আমি বিয়ে করতে পারি না। যদি করতে পারতাম তাতে যৌতুকের জন্য গরুর খরচ অনেকটা বেঁচে যেত। তোর কাছে গোপনে বলছি, অনেক সময় নিজের মেয়ের উপরই লোভ হয়েছে। সে লোভ মেটাবার জন্য মরণও তুচ্ছ মনে করতাম, যদি আমার মরণ ছাড়া আর কারু কিছু তাতে না হত। আমার পাপের ফলে সমাজের কি অবস্থা হবে তা যখন ভাবি, তখন আর কি করব, বুড়ীকে নিয়েই খুশী থাকি। অথবা কোন ছুঁড়ির জন্য তিনটে গাই ছেড়ে দিতে হয়। ছুঁড়িটার যে মুরগির মত এক গাদা পিরিতের লোক থাকবে, এ কথাও ভাল করেই জানি। কার ডিম সে পাড়বে তা আমি গেরাহ্যি করি না, ডিম ত সব আমার ঝুড়িতেই পড়বে।

'সম্পত্তি সম্বন্ধেও তোকে কিছু বলতে চাই। তোর জীবন, তোর ঘরের দেবতা, তোর অস্তর ও হাতিয়ার, তোর জমি-জিরেত, তোর বউগুলো, তোর পশুপাল, তোর পাখির দল—সবই তোর। কিন্তু কিছুই তোর নয়, জ্ঞাত-কুটুম্ আপনার জন যদি গরিব ও অভাবী হয়, তা হলে সব তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। দরকার হয়, এদের জন্য তোর প্রাণও দিতে হবে।

'পাপের ফলও জেনে রাখ। রক্তের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে, তার জন্য দেবতা আর মৃত আত্মাদের কাছ থেকে শাস্তি আসবেই। কেবল তোর উপরই নয়। তাই যদি হত, সে দায় সহজেই বওয়া যেত, আফসোসও হতো না মনে। কিন্তু শাস্তি আসবে সমস্ত আপনার পরিজনের উপর, এই বংশ, ও বংশ—যেসব বংশ নিয়ে আমাদের জ্ঞাতগুষ্টি—সবার উপর। পূর্বপুরুষদের উপর, ভবিষ্যতে যারা জন্মাবে তাদের উপর পর্যন্ত। রক্তের সম্পর্ক লঙ্ঘন করে তা স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত না করার অপরাধের জন্য সকলকেই কষ্ট পেতে হবে। ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখ্ বেটা। প্রাচীনদের বিধান যখন কঠোর ও অসহ্য মনে হবে—এই কথা ভেবেই তখন শান্তি পাবি।'

সমস্ত স্নায়ু ও শিরাগুলি সংহত করে কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে ওপোকু।

ওর বাপ বলেই চলে ঃ

'আর একটা ব্যাপার আছে, সে সম্বন্ধে আমি যা জানি, তুইও এর মধ্যে বোধ হয় ততটাই জানিস। একটা লাল জাতের মানুষের কথা তুই শুনেছিস, অনেক দূর দেশ থেকে আসে তারা। কচ্ছপ বংশের একটা লোক জাত থেকে তাড়া খেয়ে অনেক চাঁদের পথ পেরিয়ে বহুৎ দূর চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে আসে কুমীরের জলে ঝাঁপ দিতে। সে বলেছে

যে লাল জাতের লোকগুলোর গায়ে গা-ঘুলোনো কুমীরের গন্ধ, হয় ত বা দুদিনের বাসি মড়ার পচা গন্ধ। তাদের মধ্যে আধেক লোক কোন দেবতাকেই ডরায় না, আর বাকী আধেক সাত দিন অন্তর প্রার্থনা করে সেই আকাশ-দেবতার কাছে, যাকে আমরাও আমাদের অভাব জানাই। ডাইনিদের মত সব রকম ক্ষমতা আছে এই লাল মানুষগুলোর। তাদের নৌকোর নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বার হয়। সেগুলি যেমন চলে জলের ওপর, মাটির ওপরও তেমনি চলে। সারা গা, এমন কি, পা পর্যন্ত তারা ঢেকে রাখে, খুলে রাখার সাহস হয় না। আমাদের মধ্যে যাদের গায়ে পচা বদ্‌গন্ধ ঘা হয়, লজ্জায় তারা যেমন গা ঢেকে রাখে, ঠিক তেমনি।

'তোকে সব শিখিয়ে দিলাম এবার তুই পুরো মরদ বনেছিস।'

যতক্ষণ এই দীর্ঘ বক্তৃতা চলেছে, ওপোকু স্থির হয়ে বসে থেকেছে বটে, কিন্তু দারুণ অশান্তি ও অস্বস্তি নিয়ে। বোনের সঙ্গে বে-আইনি সম্পর্কের প্রতিটি খুঁটিনাটি ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে! পিতার দীর্ঘ ভাষণের মধ্যে এই সম্পর্কের উক্তির তলায় চাপা পড়ে কোথায় তলিয়ে গেছে আর সব কথা। সে সব তার চেতনায় আবছায়ার মত জেগেছে, মঞ্চের সামনের দিকে অভিনীত ভয়াবহ কোন নাটকের পটভূমিকার মতই অস্পষ্ট। আমালাগানের প্রতি মোহ, আর সে মোহ থেকে মুক্ত না হলে তার যে পরিণাম ঘটবে—এই দুই সমস্যার মধ্যে দুলছে ওপোকুর মন। যা ঘটে গেছে, তা কেমন করে গোপন রাখা যাবে; কি করে ঠেকানো সম্ভব হবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল—এই চিন্তাই ওকে বিব্রত করতে থাকে। অতীতের কৃতকর্মের জন্য ভবিষ্যৎ আজ বিপদসঙ্কুল। যে পাগলামি ও আহাম্মকী সে করেছে, আর তার পুনরাবৃত্তি সে ঘটাবে না। বাবা তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছে। কিন্তু পার পাবার কোন পথ আছে কি?

আত্মহত্যা, খুন, পালিয়ে যাওয়া—একটার পর একটা চিন্তা ওপোকুর মানসপটে চমক খেলে যায়।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়, সস্নেহে হাত রাখে ছেলের মাথায়। বলে, 'ওঠ্, বেটা! অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—যতদিন চিতাবাঘের বংশ বাঁচবে—সবকিছুর সঙ্গে আজ তুই এক হয়ে গেলি।'

পঞ্চম অধ্যায়

যে সময় ওপোকুর ওই কঠোর পরীক্ষা চলেছে, আমালাগানের উপরেও অনুরূপ উপদেশধারা বর্ষিত হয়েছে। তার মায়ের কাছ থেকে নয়, মাতৃকুলের একজন বর্ষীয়সী দিয়েছে এই উপদেশ। এই মহিলা আমালাগানের গর্ভধারিণী না হলেও তাকে 'আমার বেটী' বলেই সম্বোধন করে। উপদেশদাত্রী রূপসীর নিজের বংশের লোক নয়, তাই তার বক্তৃতায় চিতাবাঘ বংশের বাধা-নিষেধের ফিরিস্তি শোনা যায় নি। মেয়েটাকে সে মূলত রক্তের বাধা-নিষেধের কথাই বোঝাল। আফ্রিকার সমাজে রক্তধারার, উত্তরাধিকার মেয়েদের ভিতর দিয়েই চলে। রক্তসম্পর্কিতদের মধ্যে যৌন-সম্পর্ক তাই একেবারেই নিষিদ্ধ। দেবতারা ও মৃত আত্মারা এ মহা-পাপের শাস্তি বিধান করবেই। শুধু অপরাধীর প্রতিই নয়, সমগ্র গোষ্ঠীর উপর নেমে আসবে সে সাজা।

আর যে সব উপদেশ আমালাগানেকে দেওয়া হল, ওপোকুকে দেওয়া উপদেশের সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎ নেই। ওপোকুর বেলায় যেমন সেগুলির কোন অর্থ ছিল না, আমালাগানের বেলায়ও তাই। যে বিধান দুজনের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা রদ করে দিয়েছে, ওপোকুর মত আমালাগানের চিন্তাও তাতেই নিবদ্ধ। গোপনে সে বিধান দু জনেই লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু এই সব বিধি-বিধানের বক্তৃতায় আমালাগানের মনের প্রতিক্রিয়া ওপোকুর থেকে ভিন্ন পথে চলেছে। বসে বসে শুনতে শুনতে আমালাগানের সমগ্র সত্তা মানুষের তৈরী আইন ও বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মনোরমা তরুণী সে, বন্য রক্ত তার ধমনীতে, মনের মত স্বামী নির্বাচনের অধিকার সে দাবি করে। মনের মানুষ বেছে নিয়ে তার জয়কে সার্থক করবার অধিকারও-সে চায়।

রূপসীর কুমারী জীবনের কাল এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নিয়মে তার যখন দীক্ষা হবার কথা, তখন ফসল ভাল হয় নি, খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। বোধ হয় সেই জন্যই ও একেবারে বিগড়ে গেছে। বিয়ের যেখানে নিষেধ আছে, গোষ্ঠীর রীতি অনুসারে সেই সব তরুণ-তরুণীর মধ্যে বেশ খানিকটা স্বাধীন মেলামেশা চলতে পারে এ কথা সত্য। কিন্তু তার মধ্যে এ বোঝাপড়া থাকে যে কুমারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করা হবে। এই যে শিথিল ব্যবস্থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সভ্য সমাজে যাকে বলে চারিত্রিক শুচিতা, তার কিছুটা বজায় থাকে এদের মধ্যে। তবে তা কোন নীতিবিচার থেকে আসে না, এমন এক দৈহিক অবস্থা রক্ষা করে চলতে হয়, সংযম যাতে অপরিহার্য।

দেহের উপর বেদনাদায়ক যে অস্ত্রোপচার অবিলম্বে ঘটবে, তাতে যে দেহের কামনা ঝিমিয়ে আসবে, রূপসী তা ভালো করেই জানে। একবার রতিরসের আস্বাদ পেয়ে ভেসে গেছে সে তার স্রোতে। জীবনে যা-কিছু সেই অনুভূতির আওতার বাইরে, সব কিছুকেই মনে হয়েছে বিরস ও বিস্বাদ। তারপর সে আবিষ্কার করেছে, কেমন করে সূক্ষ্ম কৌশলে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ কর্মগুলিও প্রেমস্বপ্নের জালে ঘিরে রাখা যায়। এ চেষ্টায় সে যতটা সফল হয়েছে, এতদিনের কঠোর ও একঘেয়ে জীবনে প্রাণের সাড়া জেগেছে সেই পরিমাণ। রঙীন ও উচ্ছল জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। প্রেমাকুলা আফ্রিকান নারী সে, প্রেম লাভের আগ্রহও তার প্রচুর। কর্তব্য-বোধ ও অন্যের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তার প্রেমাস্পদকে প্রভাবান্বিত করেছে, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে দিয়েছে। কিন্তু অনুরূপ কোন অনুভূতি রূপসীকে স্পর্শও করেনি। এতটুকু ভয় জাগেনি ওর মনে। পরিণাম সম্বন্ধেও রূপসী একেবারে উদাসীন।

যে নিষ্ঠুর সামাজিক পদ্ধতি মানুষের তৈরী আইনের কাছে তার আত্মসমর্পণে অনেকখানি সহায়তা করবে, সেই পদ্ধতিকে প্রশ্ন করবার কথা কিন্তু চিন্তা করে না রূপসী। সামাজিক সংস্কার এতখানি প্রবল যে দেহ-বিকৃতি থেকে পার পাবার ইঙ্গিতও যদি কেউ করে, আমালাগানে তাতেই বরং আপত্তি করবে। তা যাই হোক না কেন, ওপোকুকে এখন ত্যাগ করা — ও তা কোন মতেই পারবে না। কর্তামার অনুশাসনবাণীগুলি সে যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনে চলে ঃ

'সাবধান থাকবি বেটী, নাচের মধ্যে কোন বেয়াড়াপনা করবি না, আর নিজের মনগড়া কোন নতুন তালে নাচাও চলবে না। তা করলে ভিটের বদনাম হবে, তোকে কেউ বলবে না, 'অমুকের ভালো মেয়েটা।'

হো হো করে হেসে ওঠে রূপসী। খোলাখুলি বিদ্রোহ করে বসেছে সে। যে উপদেশ দিচ্ছিল যৌবনে তার অনেক প্রেমিক ছিল। কিন্তু আজ এ-বয়সে কারুর আর তাকে মনে ধরার কথা নয়। নিজের যৌবনমাধুর্য ঝরে গেছে বলেই বোধ হয় আমালাগানের আহ্লাদে তার রাগ হয় আরো বেশী। যখন বর্ষীয়সীরা তরুণীদের ফুর্তি ও প্রেমকে তিরস্কার করে, তার মূলে ঈর্ষাই থাকে প্রবল। এই জন্যই শাশুড়ীর ভিটেয় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার রেওয়াজ নেই ওদের সমাজে।

'পেত্নীর ভয়ও নেই তোর!' আমালাগানের হাসি দেখে রিষের সঙ্গে বলে ওঠে বুড়ী। রূপসীর অন্তর কেঁপে ওঠে। যে পথ সটান খোলা মনে হয়েছিল, তা আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে বসে অনুশাসনগুলি শুনে চলে ; অন্তত বাইরে ভাব দেখায় যেন খুব মন দিয়েছে। বুড়ীর শেষ কথায় সব দুঃখের একটা প্রতিদানের আশ্বাস পায় রূপসী, আর তাই জীবনের পরম সম্বল মনে হয়। বুড়ী বক্তৃতা শেষ করে ঃ

'যখন একটু ভালো হয়ে যাবি বাছা, ও-জায়গার ঘা-টা একেবারে শুকিয়ে যাবে, তখন সব চেয়ে যে তাগড়া মরদ, তার সঙ্গে যত খুশী পড়শীর কুমড়ো ক্ষেতে লাফিয়ে বেড়াতে পারবি।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

সারা বনানী জুড়ে নেমেছে অন্ধকার। গাছের মাথার ওপর দিয়ে চাঁদ উঠে আসেনি এখনও। এখানে সেখানে সর্বত্র দপ দপ করে আগুন জ্বলছে, সমস্ত অঞ্চলটা দেখাচ্ছে যেন কোন ক্যারাভানের রাতের আস্তানা।

ছোট ছোট দল গোল হয়ে বসে আছে, দু থালা করে খাবার ঘিরে। একটার মধ্যে রয়েছে ঢেলা পাকানো পিঠের মত, অপরটায় রয়েছে মাংসের ঝোল। দু-এক টুকরো মাংসও হয়তো আছে। থালা-গুলোর মধ্যে সবাই পর পর একবার করে আঙুল লাগায়। প্রথমে পিঠে ভেঙে নেয় একটুকরো, তারপর ঝোলে তা ঠেকিয়ে নেয় একটু। মাংস এদের মধ্যে রীতিমত বিলাসখাদ্য, ভাল মুখ করার প্রয়োজনে অতি সামান্যই তা খাওয়া সম্ভব।

মাঝে মাঝে নাকাড়াগুলো বেজে ওঠে। বাজনদারেরা এক-আধটা গৎ এখন-তখন ঘোষণা করে শুধু। শ্রোতাদের কাছে কিন্তু নাকাড়াগুলো ভাষণশীল জীবন্ত যন্ত্র। এর ধ্বনির মধ্যে কোন রহস্য, কোন গোপন সঙ্কেত—কিছুই নেই। সহজ সরল এবং সুস্পষ্ট এর ভাষা।

নানা বাক্যাংশ ও পৃথক পৃথক পদের সমন্বয় নেই এদের ভাষায়। ক্রিয়াপদ, বিশেষ্য, সর্বনাম, সংযোজক—এসব কিছুই জানে না এরা। যতি ও বিভিন্ন গ্রামের সুরতরঙ্গসমষ্টি নিয়ে নাকাড়া যে বোল তোলে, তাতেই ওদের একটি বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ হয়। ধ্বনিই এ ভাষার প্রাণ। কখনো নীচু, কখনো উচু, কখনো মাঝামাঝি গ্রামে বিচরণ করে সে ধ্বনি। নাকাড়ার শব্দগুলি বিভিন্ন গ্রামে বাঁধা। যথাযথ ধ্বনিতরঙ্গে আন্দোলিত হয়েই তার বক্তব্য প্রকাশ করে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ওরা

এই ধ্বনিগুলির পরম্পরা থেকেই তার অর্থ বুঝতে পারে, ঠিক যেন মুখের কথা।

শুধু তাই নয়। নিছক বাদ্যযন্ত্রই নয় নাকাড়া, এর প্রতিটি অংশের নিজস্ব দেবতা আছে, নাকাড়াটা সেই দেবতাদের মন্দির।

রূপসী ও ওপোকু নিজ নিজ পরিবারের দলে বসে। পালা মত খাবারের থালায় আঙুল ডুবিয়ে নেয় ওরা। মনে মনে বলে রূপসী : 'আজ রাতে ওকে আমার কাছে আসতে হবে। তার পর হয় ত আমি সমাজের হুকুম মেনে চলব।'

ওপোকুর মনের ভাব কিন্তু বিপরীত। রাতের গহন গহ্বরে যে উন্মাদনা তাকে টানছে, তার হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাবে, সেই কথাই সে চিন্তা করে। চুপ করে বসে নাকাড়ার বাজনা শোনে আর খাবার চাখে।

ওপোকুর জীবিকা হল শিকার। বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তার দিন কাটে। একেবারে একা একা কত দূরে ঘুরে বেড়ায়। নদীর ধারে, নিবিড় বনে, জলার মধ্যে কত দিনরাত ও কাটিয়েছে। প্রকৃতির এই সবকিছুর সঙ্গে মনকে এক গভীর সহানুভূতির সূত্রে বেঁধে ফেলেছে ওপোকু।

নিবিষ্ট মনে নাকাড়ার ধ্বনি শোনে ওপোকু। নিচু আওয়াজ, জোর আওয়াজ, জোরে-জোরে-জোরে, আস্তে-আস্তে-জোরে, জোরে-আস্তে-জোরে, জোরে-জোরে-জোরে। গম্ গম্ করে ধ্বনিগুলি দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বনের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে, ক্ষীণ প্রতিধ্বনির স্পন্দনে আবার তা ফিরে আসে।

ধ্বনিগুলি বলে :

পথ পার হয়ে গেছে নদী, নদী পার হয়ে গেছে পথ,
এদের মধ্যে কে প্রাচীন ?
নদীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলতে কি পথ কাটি না আমরা ?

কত কত দিন আগে জেগেছে নদী।
নদীর আদি বিধাতা,
সব কিছুরই স্রষ্টা তিনি।

কেমন করে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, কোথায় তাদের আদি, ওপোকু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কোন দিন। তাদের সমাজের চলতি গল্পে, মায়ের বলা রূপকথায় সৃষ্টির যে সব ব্যাখ্যা আছে, তাই সে চিরদিন মেনে এসেছে। তবু নাকাড়ার এই কথাগুলো ওর মনে কেমন যেন সাড়া জাগায়।

এই দলের মধ্যে একটা লোক বেশী খেয়েছে, মদও গিলেছে অতিরিক্ত। হঠাৎ তার বায়ুনিঃসরণ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দলের সবাই শূন্যে হাত তুলে তার বড় মুখ ও খাঁদা নাকের সামনে তালি দিয়ে ওঠে। যাতে কেউ হেসে না ওঠে—তা ফিক করেই হোক বা হো হো করেই হোক—এক মুহূর্তের অদ্ভুত নীরবতা ভঙ্গ করে তাই সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে:

'একটু পরেই সব চেয়ে উঁচু বায়োবাব গাছটার মাথায় চাঁদ উঠবে …'

'হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম, আমার পাঁঠাটাকে কান কেটে ছেলের মানত করা দেবতাকে নিবেদন করব।'

'ঠিক তাই,' বলে এক খুড়ো, 'ভাইপোগুলোই ওই রকম, যেন বাজপাখীর বাচ্চা …'

একটা লোকের অসভ্য ব্যবহারের ফলে পাছে কোন বিশৃঙ্খলা জেগে ওঠে, তা চাপা দেবারই সদয় প্রচেষ্টায় চলে এই কথোপকথন। কেউ হেসে ফেললে লোকটা হয় ত আত্মহত্যাই করে বসবে। বিষাক্ত তীরের চেয়ে টিটকারীর মারণশক্তি একটুও কম নয় আফ্রিকান সমাজে।

এত বড় রূপোর থালার মত চাঁদ ধীরে ধীরে উঠে আসে উপরের দিকে। তার উপরকার ছায়াগুলি ওদের কাছে স্বর্গের নাকাড়াবাজিয়েদেরই পার্শ্ব-

মূর্তি। একেই ওরা বলে 'চাঁদের মানুষ'। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই নাকাড়ীর দল চিরন্তনী প্রথা মত বচন তোলে ঃ

'স্বর্গের নাকাড়া-বাজিয়ে বলছে সে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল,
এখন আবার ফিরে এসেছে।
তোমায় উদ্দেশ করে আমরা যা বলছি,
তুমি তা বুঝতে পারবে।
তুমি বুঝতে পারবে
কি বলছি তোমায় উদ্দেশ করে।'

অন্যান্য দেবতাদের তুষ্টি বিধানের এটা হল ভূমিকা। যে হাতীর কানের চামড়া থেকে ঢাক ও নাকাড়ার উপরকার শক্ত অথচ পাতলা ঢাকাটা তৈরী হয়, বাঁকা আংটাগুলোর সঙ্গে চামড়াটা টেনে শক্ত করে বাঁধা হয় যে লিয়ানা লতার ছাল দিয়ে, সে সবের দেবতাকেও তুষ্ট করতে হবে। সব শেষে আছে আংটাগুলোর নিজস্ব দেবতার তুষ্টি।

ওপোকু মন দিয়ে শোনে। এই সব আনন্দের তলায় সাময়িকভাবে তার প্রেমকাহিনী চাপা পড়ে যায়।

'হে মহাশক্তিধর আত্মা, আঙ্কামানেকো,
নাকাড়া-বাজিয়েদের সঙ্গে এক সাথে শুরু হবে তোমার যাত্রা।
হে আঙ্কামানেকো, হে মহাশক্তিধর আত্মা,
নাকাড়া-বাজিয়েদের সঙ্গে একই সাথে তুমি ফিরে আসবে।'

'হে বিরাটকায় গ্যায়েণ্ডু, লোহিত বরণ (১)
জলাভূমি তোমায় গ্রাস করেছে।
হে মহাবারণ

১। লাল কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে।

হে কুড়োল-ভাঙা হাতী। কুড়োল ভেঙে দিয়েছ তুমি।

হে হস্তীদেব
স্বর্গের নাকাড়ীরা ঘোষণা করেছে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সে,
উঠে এসেছে নিজে নিজে।
আমরা তোমাকে উদ্দেশ করে যা বলছি
তুমি তা বুঝতে পারবে।
হে আম্পাসাকায়ি, গাছের ছালের দেবতা!
তুমি কোথায় আছ?
স্বর্গের নাকাড়া-বাজিয়ে ঘোষণা করছে ···

তারপর শুরু হয় অন্য সব দেবতার আবাহন, নৃত্যোৎসবে যেন তাদের অধিষ্ঠান হয়ঃ

দেবী-বসুমতি, যতক্ষণ বেঁচে আছি
তোমারই উপর আমার নির্ভর।
দেবী-বসুমতি, তুমিই আমার দেহ গ্রহণ করবে,
স্বর্গের নাকাড়া-বাজিয়ে ঘোষণা করছে ···
হে ডাকিনী, আড়ুয়ু আমাকে হত্যা করো না,
আমাকে ছেড়ে দাও আড়ুয়ু,
স্বর্গের নাকাড়া-বাজিয়ে ঘোষণা করছে ···
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে সে,
উঠে এসেছে নিজে নিজে।
আমরা তোমাকে উদ্দেশ করে যা বলছি
তুমি তা বুঝতে পারবে।

"ক্রা হি কাটা, কাটা, ক্রা হি কা ;
ক্রা হি, ক্রা হি ক্রা।"

মুক্ত অঙ্গন এখন দিনের মত আলোকিত, রূপালি রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে যে সব কালো ছায়া, তাতে আরও উজ্জ্বল হয়েছে জ্যোৎস্না। যারা ভোজন ও পান করছিল, তারা দল ছেড়ে উঠতে শুরু করেছে। মেয়েরা চলেছে থালা বাসন সাফ করতে।

আমালাগানেও বাসন ধোওয়ার কাজে সাহায্য করতে চলে যায়। এই সব বিরক্তিকর কাজে আজ সে অপরিসীম আনন্দ পায়।

কাজ সেরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে রূপসীও ঘরে ঢুকে পড়বে। প্রসাধনের শেষ স্পর্শটুকু লাগাতে হবে যে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ইতিমধ্যেই নাচগান শুরু করে দিয়েছে। তাদের তারস্বরের সঙ্গে তালে তালে ছোট হাতের তালি বাজে।

যারা ছিল নিছক দর্শক, ক্রমে ক্রমে তারাও এসে বাজিয়েদের চারপাশে জড়ো হতে থাকে। উদ্দাম আনন্দোল্লাস কে প্রথম শুরু করবে, এই সঙ্কোচে এরা সলজ্জভাব দেখায় বটে, কিন্তু নাচে মেতে যেতে এদেরও দেরি হবার কথা নয়। ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে সব চেয়ে যার উৎসাহ ও সাহস বেশী, সে-ই জনতার বৃত্ত ভেদ করে হঠাৎ ছুটে আসে মাঝখানের ফাঁকা চত্বরে, শুরু করে দেয় তার কসরৎ। বাহবার চীৎকারে অভিনন্দিত করে তাকে জনতা।

লাল ধুলো উড়ে চলে বাতাসে। জনতা হাততালি দিতে শুরু করে। মরদরা হাতে হাতে তালি বাজায়, মেয়েরা ডান হাতের পাতায় নগ্ন দক্ষিণ উরুতে চাপড় মারে। বাঁ হাতটা দু উরুর মাঝখানে চেপে ধরে মেয়েরা, শালীনতা বোধ থেকে নয়, চাপড়ের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিই

উদ্দেশ্য। সুরের খেলা, স্বরের উত্থান-পতন, ধ্বনিকে তালে বাঁধা—প্রকৃতির এই সহজাত বাদ্যযন্ত্রেই সর্বপ্রথম পরীক্ষিত হয়েছিল নিশ্চয়।

একজন বয়স্কা মহিলা মেয়েদের নাচের দলকে সংহত করবার উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। তার বাহু সুপুষ্ট, উরুযুগ বিশাল, উদর এবং নিতম্ব মেদবহুল। অন্য কয়েক জন ছুটে ছুটে বাজনদারদের পচাই সরবরাহ করে। নাকাড়াগুলোকেও ভোলেনি এরা। সে গুলির সামনেকার আংটাতে অর্ঘ্য ঢেলে দেওয়া হয়। একদল কুমারী তাদের লঘু চপল পদক্ষেপের ঢং-এ দর্শকদের ভিড়ের ভিতর ঘূর্ণি তুলে মুক্ত চত্বরে এসে জটলা পাকায়। পার্শ্বপটের আড়াল থেকে নটির দল মঞ্চে আসে যে ভঙ্গীতে, অনেকটা সেই রকম।

শুরু হয়ে যায় নাচের হর্‌রা। দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, কে আসবে সামনের সারিতে। বাচ্চার দল বড়দের দু পায়ের ফাঁক গলে এগিয়ে আসে। অতিরিক্ত নাছোড়বান্দাগিরিতে বিরক্তি সৃষ্টি করছে যারা, তাদের উপর দু-চারটে আদরের চড় চাপড়ও না পড়ে তা নয়।

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দু সারি নাচিয়ে মেয়ে। বাজনার তালে তালে তাদের পা চলতে থাকে। ক্রমে চাঞ্চল্য বেড়ে যায়। সারা দেহ, প্রতিটি অবয়ব উদ্দাম গতিতে আন্দোলিত হতে শুরু করে। হাত-পায়ের ও গলার পেশীগুলি নানা ভঙ্গীতে দুমড়ে দুমড়ে মুচড়ে ওঠে, ঢেউ খেলে যায় উরুতে, কেঁপে কেঁপে ওঠে নিটোল স্তনযুগ। দেহ-সঞ্চালনের তীব্র ছন্দ নাকাড়ার বোলের সঙ্গে অনবদ্য তাল রক্ষা করে চলে। দলের প্রধানা এগিয়ে এসে গান জুড়ে দেয়ঃ

বুনো গাঁয়ের আমরা যত কুমারী
ছ্যাদন মোদের হয় নি এখনও …

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত স্বর ওঠে :

গিরিডির কথা সবই মোরা জানি
হায় লো, গিরিডি ত পাইনি কখনো…
বনের গাঁয়ে আমরা যত কুমারী
হায় লো …

সুর-তাল-ছন্দ বদলে যায়, গান ওঠে :

কিসের লেগে যায় মোদের
বল্ লো বল্ ?

সমবেত সুর জবাব করে :

নিবিড় চাপে জড়িয়ে ধরে
জাপড়া যত পাহাড়গুলোরে
শাড়ীগুলো জবাব দেবে, চল্ ।
'কিসের তরে গো ?'
পাকিয়ে গায়ে উঠছে বেয়ে গিরান্দা,
সেই লতাকে এগিয়ে দিয়ে পথ না ।

প্রথম কলির সুরে ফিরে আসে গান :

মাথার আমার অধীর হয়ো না,
কি তোমারে দিব দেখো না ।

গাইয়েদের সারি দুটী পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় মুখগুলি । কোন ভাবের প্রকাশ নেই দেখ কি অভাব উদাসীনতা দেগে বসে আছে, ঘোষণা করছে পরম হতা চরম আত্মসমর্পণ । প্রেমের চরম মুহূর্তেও একটুকু হাসি প্রকাশ পা নে তাদের মেয়ের মুখে, এই পরিবেশে মুখের এই ভাবহীনতা তাদের সম্ভব ।

দু ধারের দু সারি আরো কাছাকাছি সরে আসে। তারপর এক সারির মেয়েরা বিপরীত দিকের মেয়েদের কাছে পরস্পর নিজেকে বিলিয়ে দেবার উপক্রম করে। উৎকট একটা শব্দ করে বাহবা দেয় দর্শক দল। নাচে তারাও অভিভূত হয়েছে, তাই প্রকাশ করে।

শব্দটা হয় অদ্ভুত ভাবে। দু ঠোঁট বাড়িয়ে দিয়ে মুখ থেকে হাওয়া ছাড়ে, তারপর ঠোঁটের উপর দিয়ে এমন ভাবে দ্রুত আঙুল চালায় যে তীব্র এক সুরতরঙ্গ ওঠে তাতে। অনেকটা এই ভাবেই গোরিলাও অনুরূপ শব্দ করে, তবে সুরলহরী তুলতে তারা থুতনির নিচে গুঁতো মারে।

নাচিয়ে মেয়েদের দু সারি পরস্পর মিলিত হবার ঠিক আগেই থেমে যায় কিন্তু। তারপর কিছুটা পিছিয়ে দ্রুতপদে মিলিয়ে যায় দর্শকদের ভিড়ে। নতুন দল এসে তাদের জায়গা নেয়। পুরুষরা তখনও সরে আছে, কারণ রাত তখনও বেশী হয় নি। চাঁদ সরে মাথার উপর উঠছে। গাছের ছায়াগুলি ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ।

প্রকৃতির এক দাবি মেটাতে ওপোকু ওখান থেকে একটু দূরে সরে এসেছিল। ঘাসের উপর সে বসতে যাবে, এমন সময় কাঁধের উপর কার হাতের স্পর্শ অনুভব করে। চাপা গলায় ফিস ফিস করে কে বলে—'আমি তোকে চাই।'

ওপোকু মুখ ফিরিয়ে জবাব দেবার আগেই, সেই ছায়ার অন্তরাল থেকে বিরাট কালো কি একটা প্রকাণ্ড দেহ তাদের থাবা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা বদগন্ধে ওপোকুর গলা আটকে আসে। পর মুহূর্তেই মনে হয় ও একা। আধা-আচ্ছন্ন অবস্থায় সে উঠে বসে, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘ বংশের সংগ্রামী রব হেঁকে ওঠে—কিয়ে-হু, কিয়ে-হু।

মা-বসুমতী রক্তপাতে কলুষিত হবে সেই আশঙ্কাই এই সঙ্কেতে

প্রকাশ পায়। অকারণ এই রব তোলা তাই মহাপাতক। সেই জন্যই এই রবকে নিঃসন্দেহে বিপদের সঙ্কেত বলে মেনে নেয় সবাই।

চকিতে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সব। গানবাজনা, চলাফেরা সব কিছু থেমে যায়। অরণ্যরাজ্যের নৈশধ্বনিগুলি শোনা যায় শুধু। কথা বলতে শুরু করে যারা থেমে গেছে, মুখ তাদের খোলাই থাকে। হাত-পায়ের সঞ্চালনও থেমে যায়; যে যে-ভঙ্গীতে ছিল ঠিক সেই অবস্থায় থাকে। কোন যাদুকর সহসা সব কিছুকে নিশ্চল করে দিয়েছে মনে হয়।

'কিয়ে-হু, কিয়ে-হু, কিয়ে-হু …'

নিস্পন্দ জনতার প্রাচীরে এসে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ। নিঃশব্দে সবাই চেয়ে দেখে শুধু। হঠাৎ তাদের ঠেলা মেরে ওপোকু একেবারে নাচিয়ে মেয়েদের বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ওপোকু দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, লাল রেখা বয়ে নেমেছে বুকের উপর দিয়ে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে সবাই। ও যেন কোকো, মৃতের রাজ্য থেকে প্রেতাত্মা উঠে এসেছে।

অতি ধীরে জনতা নড়ে ওঠে। এত ধীর সে স্পন্দন, যে লক্ষ্য করে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না পরিবর্তন। এমন নিঃশব্দে দেহভঙ্গী পরিবর্তিত হয় সবার, যেন ছায়াছবির দৃশ্যান্তর ঘটছে। প্রতিটি গোষ্ঠীর মোড়ল নড়েচড়ে এতক্ষণে নিজের দল গুছিয়ে নিয়েছে। তূণমুক্ত তীরগুলিকে ধনুকের চ্যাপ্টা ছিলার সঙ্গে আলগোছে ধরে নিয়েছে সবাই। পরম উৎকণ্ঠায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে।

'সিংঙ্গি, একটা সিংঙ্গি, একজনকে টেনে নিয়ে গেছে!'

ব্যাপারটা বোঝা যায় এতক্ষণে। শত কণ্ঠে মিলিত রব ওঠে, 'কিয়ে-হু!'

'ওই!' ওপোকু দেখিয়ে দেয়। 'আমি ওর পিছন পিছন যাই, তোরা সব ছড়িয়ে পড়্!'

দল বেঁধে শিকার করা যাদের অন্যতম বাৎসরিক পর্ব, শ্বাপদকে অনুসরণ করতে কার কি কর্তব্য, কাকে কোথায় থাকতে হবে, প্রতিটি দল তা সঠিক ভাবেই জানে। ইতিমধ্যে ওরা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে ডাইনে বাঁয়ে, যেন একদল শিকারী কুকুর।

দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে দু পাশ থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে ওরা। সারিটা ক্রমে বাঁকা হয়ে বৃত্তাকার গ্রহণ করে। তারপর ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে ছোট হয়ে আসে বৃত্তটা। একজন একটা তরমুজের খোলা ভরতি জল ছুড়ে দেয় ওপোকুর গায়। ওর এক গালে ও বুকের উপর গভীর ক্ষতে কাঁচা মাংস দগ্‌ দগ্‌ করে ওঠে। নারী ও শিশুর দল পথ করে দেয় ওর যাবার জন্য।

যে পথে সিংহীটা গিয়েছে তা সড়কের মত খোলা। মানুষটাকে টানতে টানতে ধীরে ধীরে গিয়েছে পশুটা। এই খোলা পথে ওপোকু ও আরো জনকয়েক সিংহের চিহ্ন ধরে দ্রুতপদে এগিয়ে চলে। কতকগুলি শুকনো ডালপালায় আগুন ধরিয়ে মশাল জেলে নেয়। আগুনটা যাতে নিবে না যায়, তার জন্য এগোতে এগোতে তুলে নেয় মুঠো মুঠো শুকনো ঘাস।

বড় বড় ঘাসে ভরা প্রান্তর শেষ হয়ে যায় অচিরে। শুরু হয় অন্ধকার ঘন বন। তারই ভিতর সুড়ঙ্গের মত পথ। সিংহীর খোঁজে যারা চলেছে, তারা এবার বাধ্য হয়েই এক সারিতে চলে, একের পিছনে আর একজন। চলে ধীরে, বসে বসে, কখনো হামা দিয়ে। সাপের মত দেহটা বাঁকিয়ে নিয়েও এগোতে হয় মাঝে মাঝে। সামনে অন্ধকারের মধ্যে দুটো জলন্ত আগুনের গোলা দেখা যায়। ডালপালায় লতাপাতায় জড়িয়ে গেছে ওপোকুর দু হাত। ধনুকবাণ যাতে সোজা করে ধরতে পারে তার জন্য হাত দুটো ও ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। পিছন থেকে ফিস ফিস শব্দে কে যেন বলে—'তুই তীর ছুঁড়লে তোকেও খুন করবো।'

সিংহ জাতের এক তরুণ ওপোকুর পিছন পিছন এসেছিল। সে-ই বলে কথাগুলো। সদ্য দীক্ষা হয়েছে ওপোকুর ; কথাগুলোর অর্থ তাই সহজেই সে হৃদয়ঙ্গম করে। তাই এবার ধনুকটাকে রেখে দিয়ে গুটি গুটি এগোয়। যা নিয়ে সিংহীর সঙ্গে লড়াই করতে পারে, দুই বাহু ছাড়া আর এমন কোন হাতিয়ার নেই ওর এখন। বন পিটিয়ে যারা তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল সিংহীকে, তাদের চীৎকারে যুদ্ধরব শোনা যায়। চারদিক দিয়ে আগুন ওদের ঘিরে ধরেছিল। ক্রমশ তা আরো এগিয়ে আসে, চেপে ধরে একেবারে।

সেই কণ্ঠ আবার কথা কয়ে ওঠে, 'চুপ করে শুয়ে পড়, আমি সিংঙ্গির সঙ্গে কথা কই।'

লোকটা এগিয়ে আসতে ওপোকু এবং সে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে।

'বহিন, ফিরে যা, খুব হয়েছে! কোন ক্ষতি করব না তোর।' এমন স্নিগ্ধস্বরে লোকটা কথাগুলি বলে, যেন কোন দুষ্ট ছেলেকে বোঝানো হচ্ছে।

মশালের আগুনে ডানদিকের ঝোপটা জ্বলে উঠেছে। দারুণ তাপে বাতাস বইতে শুরু হয়েছে, আর সেই হাওয়াতেই আবার আগুন উঠছে হু হু করে বেড়ে। হলকানির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়, শোনা যায় কাঠ পোড়ার শব্দ। লক্ষ লক্ষ বিরাট শিখা অজস্র লেলিহান জিহ্বা মেলে ছোটে আকাশের দিকে। ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন, সারা বনই জ্বলে উঠবে অবিলম্বে।

জানোয়ারটাকে এবার ওরা দেখতে পায়। সিংহীটা এত কাছে যে তার কানের পিছনের কালো লোমগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যায়। আমালাগানের ছড়ানো হাত দুটো ওপোকুর মুখে লাগো-লাগো। আমালাগানে পড়ে আছে। মাথাটা ওপোকুর দিকে। একটা পা দেহের উপর মোড়া, আর একটা রয়েছে সোজা হয়ে। অতি ধীরে পিছু হঠছে সিংহীটা। রূপসীর সোজা পা-টা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

লোকটা আবার কথা বলে ঃ

'বাড়ী যা, খুব হয়েছে ! কথা শুনিস্ তো কোন অসুবিধা হবে না তোর।'

এবার কথার ভঙ্গিতে বেশ কিছুটা শাসানির ভাব। মুখে ধরা পা-টা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয় সিংহী। ধপ করে পড়ে যায় ঠ্যাংটা। ঠুন ঠুন বেজে ওঠে। একটা গর্জন করে পিছন ফেরে সিংহী, তার পর বিরাট লাফ মারতে মারতে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতি লাফে পায়ের তলার মড় মড় শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে।

'জলদি কর্, আগুনে খেয়ে ফেলবে আমাদের।'

আমালাগানের কব্জিটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ওপোকু, তারপর মাথাটা নিজের দিকে করে, গাছ পালা ঝোপ ঝাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে টেনে আনতে থাকে দেহটা। ধোঁয়া ভেসে চলে ওদের ওপর দিয়ে। যে আগুন ওদের গ্রাস করতে চাইছে, তারই আলো ওদের লতা ও পড়ে-যাওয়া গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। ঘন অরণ্যের সীমান্তে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ওরা। ওপোকুর সঙ্গী নীচু হয়ে রূপসীর দেহটা ঘাড়ের উপর এপাশ ওপাশ করে তুলে নেয়, মরা হাঁসটাকে বয়ে নেয় যেমন করে।

এখানে,সেখানে ঘাসগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। তাই এড়িয়ে এঁকে বেঁকে টলে টলে পথ চলে সবাই। ইঁদুর, তিতির, ছোট হরিণ, কখনো বা একটা সাপ ছুটে চলে যায় ওদের গা ঘেঁষে। অগ্নিশিখাজাত বাতাসে ও ধোঁয়ায় অগুন্তি পোকা ঠেলে ওঠে আকাশে। লোকগুলো ক্রমে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ে, আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়

'ম্বেয়োম, ম্বেয়োম—'

গুন গুন করে আউড়ে চলেছে দৈবজ্ঞ, আর সামনে রাখা জিনিসগুলোর উপর তালে তালে ঢুলছে।

গ্রামে উত্তেজনা কিছুটা চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে শঙ্কা। কি জানি কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে! বাইরের থেকে যারা এসেছিল নৃত্যোৎসবে যোগ দিতে, তারা সবাই বাড়ী ফিরে গেছে। আর চিতাবাঘ গোষ্ঠীর গ্রাম তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছক বাঁধা কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। চাষবাস, শিকার, মাটির বাসন তৈরী, ঝুড়ি বোনা, আরও কত কি কাজ তাদের। এত কাজ যে ছোট মেয়েদের খেলার অবকাশটুকু পর্যন্ত মেলেনা।

সিংহীটা পালিয়ে গেছে। লাফিয়ে বেরিয়ে গেছে চারদিকের জনতা, আগুন ও ধোঁয়ার ভিতর থেকে। সিংহ-গোষ্ঠীর লোকের স্থির বিশ্বাস, আমালাগানের ঠাকুরমাই ফিরে এসেছিল। সত্যি তাই এসেছিল কি-না, তা তলিয়ে বুঝবার দরকারও নেই কারো। সিংহীটা যে আমালাগানের ডান পা কামড়ে ধরেছিল, তাতেই ত স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে। কারণ, ওই ডান পা দিয়েই ও লাথি মেরে ঠাকুরমাকে কুমীরের বিলে ফেলে দেয়নি কি? পায়ে অনেকগুলো মল ছিল, তাই যা রক্ষে পেয়েছে; নইলে একেবারে যেত পা-টা।

আশ্চর্য, বিশেষ কোন জখমই হয় নি আমালাগানের সে রাতের দুঃসাহসিক অভিযানে। কোন ক্ষতিই হয় নি। দু-এক জায়গায় কেটেছিল বটে, তবে বেশীর ভাগই আঁচড় লেগেছিল শুধু। সিংহীর হাতে আমালাগানে বা ওপোকু যা জখম হয়েছিল, তার থেকে বরং অনেক বেশী আঘাত পেয়েছিল অন্য জন কয়েক। আগুনে পুড়েছিল তারা।

কিন্তু এখন আর কি-ই-বা করার আছে, দৈবজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা ছাড়া!

সর্দার ক'দিন ধরে প্রায়ই বর্ষীয়ানদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাকে ঘরোয়া ব্যাপার বলেই ধরতে হয়। উচ্চতর পদে যারা আছে, তাদের তাতে সালিশী করতে যাওয়ার কোনই অধিকার নেই।

আমালাগানে ও ওপোকু এক বংশের লোক, একই পরিবারভুক্ত। বন্যপশু দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হয়েছে তারা। নিশ্চয়ই এর পিছনে কিছু কারণ আছে। স্বাভাবিক সুপরিচালিত জীবনের সাধারণ ঘটনা বলে কোন মতেই একে গণ্য করা চলে না, না সিংহের জীবনে, না মানুষের। দৈবীশক্তি নিশ্চয়ই কাজ করেছে এর মধ্যে। সর্দার-ভূস্বামী ইঙ্গিত করেছে যে ব্যাপারটা সত্যি গুরুতর। সে জানিয়েছে, চিতাবাঘ-গোষ্ঠীর প্রধান সর্দারকে। সর্দার জানিয়েছে বিভিন্ন দলের মোড়লকে। মোড়লরা জানিয়েছে ওপোকু ও আমালাগানের বংশের মাতব্বরদের। আর তারা জানিয়েছে ওদের বাড়ীর কর্তাদের। ফল দাঁড়িয়েছে যে, পরিবারের মধ্যে এ নিয়ে যে কোন তদন্ত হলে, তার বিবরণ যথাযথ সূত্র ধরে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের বিচারের জন্য সেখানে পৌছে দিতে হবে।

এ-ই আইন, এই রেওয়াজ। পরিবারের অন্য কেউ যতক্ষণ কারো কৃতকর্মের জন্য বিপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্তই ব্যাপারটা পরিবারের নিজস্ব। যে যা অন্যায়ই করুক না কেন, সে কাজের ফলাফল পরিবারের বাইরে আর কারোর উপর বর্তাবে না বলেই যখন যুক্তিসঙ্গত ভাবে আশা করা যায়, সে ব্যাপারটা নিতান্তই পারিবারিক। অন্য পরিবারের লোকের তা নিয়ে মাথা ব্যথা করার কথা নয়। যতক্ষণ না অন্য কোন বংশের উপর তার প্রভাব পড়ছে, ততক্ষণ কোন বংশের যে কোন ব্যাপার সে বংশেরই নিজস্ব। কোন গোষ্ঠীর কাজের ফলে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হলে, সে বিপর্যয় যদি সে

গোষ্ঠীর বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে, তবে বাইরের আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তারও বাইরে অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে যদি কারুর কৃতকর্মের ফল ছড়িয়ে পড়ে, তবেই তা হবে জাতীয় সঙ্কট।

সব চেয়ে চরমে উঠবে যদি কেউ রক্ত-সম্পর্কের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে। অর্থাৎ একই গোষ্ঠীর নর নারী যদি যৌন বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। সে পাপ যত ছোট পরিবারের যত নগণ্য লোকেই করুক না কেন, যতক্ষণ যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত না হচ্ছে, সে পাপের শাস্তি যে কেবল অপরাধী ব্যক্তির উপরই বর্তাবে তা নয়, তা পড়বে সমগ্র জাতির উপর। এমনিতে জাতীয়তার বন্ধন শিথিল। কিন্তু সর্বজনীন বিপর্যয়ের মুখে সবাই দাঁড়াবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে সর্দার-ভূস্বামীকেই সর্বোচ্চ বিচারকের কাজ করতে হবে।

কিন্তু সর্দারও নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের সাহস পায় না। মৃত আত্মা ও দেবতাদের উপরই নির্ভর করতে হয় তাকে। এ-ই আফ্রিকার গঠনতন্ত্র, এ-ই আইন, এই অলিখিত সংবিধান।

সংশ্লিষ্ট পরিবারের প্রথম কর্তব্য হল দৈবজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া। সাত সমুদ্রের পার থেকে কি করে ঝটপট খবর এসে পৌঁছয়, সভ্য জগতের এই সাধারণ ব্যাপারটা যেমন বুনো আফ্রিকানদের কাছে অবিশ্বাস্য, আফ্রিকার আদিম সমাজের দৈবজ্ঞ কেমন করে প্রেতাত্মা ও দেবতাদের কাছ থেকে খবর জেনে দেয়, সভ্য মানুষের কাছে তা তেমনি অবিশ্বাস্য। প্রক্রিয়াটা মনে হয় অদ্ভুত ও উদ্ভট। কিন্তু ওদের কাছে তা প্রত্যক্ষ স্বতঃপ্রমাণ সত্য।

দৈবজ্ঞের ব্যবসায়ের মূলধন শুধু একটা চামড়ার থলে। থলের মধ্যে আবোল-তাবোল অনেক কিছু আছে। আছে একটা ঝুমঝুমি, ও একটা ডাণ্ডা। ডাণ্ডাটার এক মাথা দু ফাঁক করা, আর মাথাটা লোহা দিয়ে বাঁধানো।

কাঠের একটা বাঁটও আছে। তার মধ্যে দুটো গর্ত করে দুটো গোল লোহার পাত বসানো।

আরো আজে বাজে যে কত কি আছে থলের মধ্যে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একটা কুমড়োর খোলা ভাঙা, দড়ির একটা টুকরো, বুড়ো গরুর নাড়ীভুড়ী দিয়ে পাকানো একটা গোলা, জনারের শীষ, মোরগ ও মুরগির ঠ্যাং কতগুলো, একটা শী গাছের গোটা—আরো কত কি। এতগুলি জিনিসের প্রত্যেকটার একটা নিজস্ব অর্থ আছে, সবাই তা জানে।

লেটিয়ে বসেই দৈবজ্ঞ ঝুলি ঝেড়ে সব কিছু ঢেলে দেয় মাটিতে। তারপর প্রেতাত্মাদের আহ্বান করে, প্রেতাত্মারা এসে ঢোকে তার দেহে। যে এসেছে পরামর্শ নিতে, সেও বসে মুখোমুখি হয়ে। দৈবজ্ঞের হাতে ধরা যাদুদণ্ডটা আলগোছে ছুঁয়ে থাকে। দু জনের হাতে ধরা দণ্ডটা মাটিতে ছড়ানো জিনিসগুলোর ওপর ঘুরে বেড়ায়, একটার পর একটাকে স্পর্শ করে চলতে থাকে।

মনের প্রশ্ন মনেই থাকে, প্রকাশ করতে হয় না। আসার উদ্দেশ্য পর্যন্ত অব্যক্ত। শুধু দণ্ডটা স্পর্শ করে বসে থাকলেই হল, জবাব আপনিই মিলে যাবে। দণ্ডটা যেমন বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করবে, তাতেই স্পষ্ট বোঝা যাবে সব কিছু। ছবি দেখে বোঝার মতই সহজ ও সরল। এই দণ্ডটা চলে দৈবীশক্তিতে। সেই শক্তিই স্থির করে দেবে, এত জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা স্পর্শ করবে দণ্ড। এই দৈবীশক্তি কখনো দৈবজ্ঞেরই পূর্বপুরুষ। আবার তা প্রকৃতি বা কোন জানোয়ারের আত্মাও হতে পারে।

নিছক বুজরুকি নয় এ সব। মনের মধ্যে যত সংশয় ও প্রশ্ন জেগে ওঠে, তার নিরপেক্ষ সমাধানের এই ওদের পথ। জবাব পেলে মন সুস্থির হয়। অনেক অপ্রিয় অথচ মঙ্গলকর সত্য আবিষ্কারের দায়িত্ব প্রেতাত্মার ঘাড়ে

ফেলে দেওয়া যায়। কঠোর বিধান প্রয়োগের অপ্রীতিকর কর্তব্যটাও তাদের নামে করিয়ে নেওয়া চলে।

দশটির মধ্যে নটি ক্ষেত্রেই দৈবজ্ঞের দণ্ড জনমনের প্রচলিত ভাব অনুযায়ী জিনিস স্পর্শ করে। তাই সিদ্ধান্ত জনগণের অনুকূল হয়, বিক্ষোভ সৃষ্টি না করেই কঠোর কাজ সম্পাদন করা যায়।

চিতাবাঘ গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈবজ্ঞ বাকোলোগো। কবে কতদিন আগে পূর্বপুরুষদের মন্দিরে যথারীতি একটা মোরগ বলি দিয়েই ওর তড়কার মত হয়। তারপর একেবারে অজ্ঞান হয়ে মড়ার মত পড়ে থাকে। সেরে উঠে ও গল্প করে, কি ভাবে ও মৃতের রাজ্যে গিয়েছিল, কি ভাবে মৃতদের আত্মার সঙ্গে ওর কথাবার্তা হয়েছিল। তারা বলেছিল জীবিতেরা যদি চায়, তাহলে মৃত আত্মার শক্তি জীবিতদের দেওয়া যেতে পারে, তাদের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু যথানিয়মে সে শক্তিকে বোধন করতে হবে। বাকোলোগোর পূর্বপুরুষদের যে মন্দির সেই বংশীয়দের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত, এরপর থেকে তা সর্বসাধারণের ভবিষ্যৎ গণনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। যে-কেউ ইচ্ছা করলেই সেখানে এসে সলাপরামর্শ করতে পারে।

নৃত্যোৎসবের দুদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় ওপোকু ও আমালাগানের বাড়ীর কর্তাব্যক্তিরা এসে হাজির হল সেই দৈবজ্ঞের আখড়ায়।

বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে বুড়ো। পরস্পর কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদান ও দু-চারটে বাজে কথার পর দৈবজ্ঞ তার ঝুলিটা এক জন কর্তার দিকে এগিয়ে ধরে। কর্তামশাই ঝুলিটার দুপাশ দু হাতে ধরে বলতে শুরু করে :

'তোর দুধার ধরেছি, কিন্তু মুখে হাত দিইনি! দেখ তোকে ধরেছি বটে, কিন্তু মুখ তোর খোলা আছে, কথা বলার কোন অসুবিধা করিনি।

আমার উপর দয়া করতে বলছি না, নিদয় হলেও আপত্তি করব না। আমাকে পাথরের ওপর টেনে নিস্, আরামের জায়গা খোঁজ করিস না আমার জন্য। সত্যি কথা জানতে চাই। অমুক তমুক বলে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাস্‌নি। যা আসল ব্যাপার তা-ই আমাকে বল্।'

ঝুলি থেকে সব কিছু ঢেলে দেয় বাকোলোগো। আবোল-তাবোল অজস্র জিনিসের ভিতর থেকে দু টুকরো চ্যাপ্টা পাথর বেছে নেয়, তারপর সে দুটোর এক পাশ চেটে নেয় একবার। এবার ওপরে ছুঁড়ে দেয় পাথর দুটো, চেয়ে দেখে কোন্ মুখো হয়ে পড়েছে। প্রেতাত্মারা রাজী হয়েছে, প্রশ্নের জবাব দেবে।

'ডাণ্ডা ধর্', হুকুম করে দৈবজ্ঞ।

ওপোকুর বাড়ীর কর্তা ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে আলগোছে ডাণ্ডাটার লোহা বাঁধানো দিকটা ধরে বসে। দৈবজ্ঞ ধরে তার চেরা দিকটা, আর বাঁ হাতে ঝুমঝুমিটা উঁচু করে ধরে।

আত্মাকে লক্ষ্য করে বাকোলোগো বলতে থাকে :

'বাপ্, সকাল হলে পর আমি আর জানতে পারি না, কেন ওরা আসে। তুই ওদের বলে দে বাপ্! আমি চাই যে তোর বাপ্-দাদাকেও ডেকে আন্। তারাও এসে বসুক আমাদের সঙ্গে। এই লোকগুলো যে আমার কাছে এসে বসেছে, এইটুকুই আমি জানি ; কিন্তু কেন এসেছে—জানি না। তুই-জানিস।

সামনে পিছনে দুলে দুলে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে শুরু করে দেয় :

ঘেয়োম, ঘেয়োম !
মার জোরে ধমাধম্।
কে বিগড়েছে জান তুমি।
বল ওদের কে রেগেছে,
আমি বাজাই ঝমঝুমি।

মার সিধে ধমাধম্
মেয়োম মেয়োম্ !

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দৈবজ্ঞ, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে। ওপোকুর বাড়ীর কর্তা প্রশ্ন করেঃ

'আমায় সলাপরামর্শ দিতে রাজী হয়েছে ওরা? দেখতে পাব কি, না, পাব না?

'ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। ডাক আমার বাপকে, ডাক আমার মাকে,' দৈবজ্ঞ গুঞ্জন করতে থাকে।

'তবে তোকে ধরে থাকি,' বলে কর্তা।

ঝুলি থেকে ফেলা ইয়ালার উপর দিয়ে ডাণ্ডাটা ঘুরে বেড়ায়। একবার এটাকে ছুঁয়ে, তারপর আর একটাকে ছুঁয়ে, নানান জিনিসের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়, এরপর কোনটা স্পর্শ করবে। আবার প্রথমটাকেই স্পর্শ করে। এমনি করে চলে বাছাবাছি।

আমালাগানের বাবা ঝুঁকে পড়ে দেখে ডাণ্ডাটা কেমন করে এক একটা জিনিস বেছে নেয়। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই দ্যাখ, একটা ঠ্যাং, এইবার কুমড়োর খোলা। ওরা ভুল করল কি? না না। ওই আবার ঠ্যাং। কি? মন্দির? অশুদ্ধ হয়েছে? তাও কি হতে পারে? দেবী-বসুমতী! তার বুকে রক্ত পড়েছে? আর কি? কিছু না।'

দুজনেরই হাত ডাণ্ডাটা থেকে আপনি খসে যায়। মাটিতে ছড়ানো জিনিসগুলির উপর গড়িয়ে পড়ে সেটা। শরীরটা চিতিয়ে নেয় দৈবজ্ঞ, সবে ঘুম ভাঙলো যেন। তারপর বোকার মত সামনেকার লোক দুটির দিকে তাকিয়ে দেখে। দুই পুরোনো বন্ধুকে চিনতে পেরে মৃদু হেসে ওঠে। শেষমেশ ঝুলির মধ্যে ইয়ালা ভরে রাখতে শুরু করে দেয়। শেষ হয়ে যায় মন্ত্রসাধন।

অষ্টম অধ্যায়

বাকোলোগো ঝুলিতে জিনিসগুলি তোলা শেষ করতেই তার মক্কেলরা একটা ছোট্ট ছেলেকে ইশারায় ডাকে। ছেলেটা ওদের সঙ্গেই এসেছিল। এবার কাছে এগিয়ে আসে, বগলের তলায় একটা মোরগ চেপে নিয়ে। দৈবজ্ঞ দাঁড়িয়ে উঠে মোরগটা নেয়, তারপর তে-কোনা বেদীটার মাথায় ধরে ওটার গলাটা কেটে ফেলে। রক্ত ও পালক ছিটিয়ে পড়ে কাদার বেদীটার গায়ে।

মোরগের ধড়টা দৈবজ্ঞ ছুড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। লাফ মেরে ও ডানা ঝাপটে উলটে পালটে ডিগবাজি খেতে থাকে পাখীটা। দুই কর্তা ও দৈবজ্ঞ পরম উৎকণ্ঠায় লক্ষ্য করে তা। সর্বশেষ একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মোরগটা। হলদে ঠ্যাং দুটো উপর দিকে উঁচিয়ে চরম কাঁপুনি দিয়ে পড়ে থাকে।

দুই কর্তা পরস্পরের দিকে তাকায়। সে তাকানোর যেন বিশেষ একটা অর্থ আছে। আত্মা যে বলি নিয়ে মোরগটাকে এই ভাবে ফেলেছে, তাতে এই কথাই সে বলতে চায় যে, দৈবগণনায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা সত্য। সবাই অভিবাদন করে দৈবজ্ঞকে। বাকোলোগো বসে পড়ে বেদীমূলে তার আসনে। বসে বসে ও আবার ধ্যান শুরু করে। হয় ত বা পথ চাইতে থাকে, কখন নতুন মক্কেল আসছে।

দু বাড়ীর দুই কর্তা নিজ নিজ বাড়ীর দিকে পা চালায়। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। অবশেষে আমালাগানের বাড়ীর কর্তা মুখ খোলে। চলতে চলতে সঙ্গীর কাঁধ ঘেঁষে এসে বলে, 'বেটা ওপোকু ত জোয়ান হল, ওর বিয়ের কথা ভাবছিস কি?'

'ওপোকুর বিয়ের কথা ত ছোট বেলা থেকেই হয়ে আছে,' উত্তর করে তার সঙ্গী। 'কাছিম বংশের এক সর্দারের মেয়ে সে, এতদিনে ডাগর হয়েছে ; ছেদন হলেই ঘরে আনব তাকে। মেয়েটার ঠাকুদ্দার আমার কাছে দুটো গাই দেনা ছিল। অনেক দিন পড়ে রয়েছে বলে যেদিন আমি দেনা শোধের জন্য চাপ দিয়েছিলাম, আসল দেনদারের বেটা আমার সঙ্গে রফা করলে, ঘরে যখন একটা মেয়ে জন্মেছে, তাই দিয়েই সে দেনা শোধ করবে। তার বিয়ে দেবে আমার বেটার সঙ্গে, আর তার জন্য কোন পণ চাইবে না ও?'

'ওপোকু কি বলে?' প্রশ্ন করে সাথী।

'ওপোকু আমার অবাধ্য ছেলে নয়। তা ছাড়া, খুব শেয়ানা। ও কখনো মেয়েদের পিছনে ঘুরে ঘরের তামাক পাতা বা মোরগ খরচ করে নি। বরং যখন তখন ধনুকবাণ নিয়ে জঙ্গলে চলে যায় শিকার করতে, কিংবা যায় বড় বড় ঘাস ভরা মেঠো অঞ্চলে।'

'বিয়ের কথা যখন তুললি,' ওপোকুর বাপ বলে চলে, 'ওর "বোন" আমালাগানের খবর কি? তার জন্য পাত্তর খোঁজা হচ্ছে কি? সে হল বাঘিনী কন্যে, বিষ বাণের ভাঁড়ারী। তার চারিদিকে যে কড়া নিষেধের বেড়া ছিল এতদিন, এখন তাকে প্রথম ভোগ করবার জন্য মরদদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। কুমারীর দিকে সবারই টান, আর অনেক গরু যাদের আছে সেই বুড়োগুলোর ত কথাই নেই।'

'তা যা বলেছিস্, অনেকেই ঘুর ঘুর করছে ওর পিছনে,' বলে আমালাগানের বাড়ীর কর্তা। 'আমার গোয়ালে চার-পাঁচটা নধর গাই বাড়বে শীগগিরই। আমালাগানের জন্য তাই আমি দাবি করেছি কি না। কিন্তু দোস্ত, আটোর ত ছ'টা গাই দিতে চেয়েছে।'

'সে কি! ওই বুড়ো সজারুটার সঙ্গে বিয়ে দিবি মেয়েটার? একটা ছানা পয়দা হওয়া পর্যন্ত ও বাঁচে ত যথেষ্ট। তার আগেই কুমীরের কথা ভাববার সময় এসে যাবে ওর।'

'কি গেল এল তাতে? অনেক বউ ওর। সেখানে ছোট বউ-এর কাজ কম থাকবে—আর পিরিত করে বেড়াবার সুযোগ পাবে।'

দৈব-গণনায় কি ধরা পড়েছে, সোজাসুজি তা নিয়ে কেউ আলোচনা তুলছে না। কিন্তু দুজনেরই চিন্তা এমন একটা কিছুকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, যার ধারে কাছে প্রথমে এসে পৌঁছতে দুজনেই নারাজ।

'ব্যাপারটা বিষম হতে যাচ্ছে বলে ডর লাগছে আমার,' অগত্যা কথাটা পাড়ে ওপোকুর বাপ। 'এ নিয়ে মোড়লদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং শেষমেশ বড় সর্দারের কাছেও যেতে হবে।'

'ব্যাপারটা তাই,' জবাব করে অপর জন, 'হাতীর পেটের বেড় মাপতে কেউ গাছের পাতা ছেঁড়ে না। এ ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে আমাদের খ্যামতাও নেই, অধিকারও নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বলে তার সঙ্গী, 'জানিস্ ত, কাছিমেরা যা বলে, তাড়াতাড়ি করা ভাল, কিন্তু ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে কাজ করারও সুবিধে আছে।'

'বেশ, বুড়োদের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখতে হবে। তবে তারা জানে যে, নিজের জলের হাঁড়ি আঁকড়ে-থাকা টিকটিকিটার দিকে ঢিল ছোড়ার বিপদ আছে। সবাই যদি সাবধান না হই, সবাই প্যাঁচে পড়ে যেতে পারি। অনেক ভাল ভাল গাই লোকসান হবে তাতে, আর কিছু নয়।'

'আমিও তাই ভাবছি,' মন্তব্য করে অপর জন, 'নিজের ঘর বাঁচানো ভালই; কিন্তু মনে রাখিস্, মাছি যদি সময় মত লাশ না ছাড়ে, তবে তাকেও গোরে যেতে হয়।'

*   *   *   *

কিছুক্ষণ পরেই এরা এসে জমায়েত হয় সর্দার ভূস্বামীর বাড়ীতে, সঙ্গে আসে বৃদ্ধ মাতব্বরের দল।

বাড়ীটা যেন এক যাদুঘর। প্রাচীন সংস্কৃতিকে জীইয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।

সর্দার দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ, দুর্দান্ত শরীর তার। সারা মাথার পাকাচুল পরিষ্কার করে কামানো। মাথাটা দেখায় যেন কালো পাথরে গড়া একটা গম্বুজ। ছোট পাকা দাড়ি মুখে, তার সঙ্গে গোঁফ। পাকা ও পুরুষ্ট ভুরুর নীচে একজোড়া সহৃদয় ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখ থেকে তীক্ষ্ণ ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি জ্বল্ জ্বল্ করছে। শরীর দেখে বয়স ধরা যায় না। বরং তার সবল পেশী দেখলে তাকে সর্দারের প্রধান কুস্তিগীর বলেই মনে হয়। বাঁ হাতে তিনটে আঁটা-সোটা তাগা। তার দুটো পাথর কেটে করা, আর একটা হাতীর পায়ের তলার চারপাশে যে শিঙের মত পদার্থটা আছে, তারই তৈরী। ডান হাতের কব্জিতে দুটো বালা, লোহার সরুপাতে বিনুনি করা। দু পায়েও সেই রকমেরই দুটো বেড়ি। এগুলো সব নিছক গয়না নয়, প্রত্যেকটিই ছোট-খাট দেও-দানা কারু-না-কারুর মন্দির বিশেষ। গলায় ঝুলছে চার ছড়া ঝক্মকে রঙিন সুতোয় পাকানো ডোর, তার সঙ্গে ঝুলছে মাদুলির তোড়া। সেগুলি ফোলা নাভির কাছে ঝলক ঝলক করছে। কোমরেও অনেকগাছি রঙিন পাকানো সুতোর বেড়। উরু ও পায়ের গুলি সুপুষ্ট, সবল ও পেশীবহুল। হাত এবং পায়ের পাতা সুগঠিত, কিন্তু অত বড় শরীরের তুলনায় ছোট বলে মনে হয়।

এ-ই সর্দার ভূস্বামী। সমগ্র গোষ্ঠীর পুরোহিত এবং রাজা। কিন্তু রাজা হলেও সভ্যজগতের রাজা থেকে এর তফাৎ অনেক। বড় ছেলে

হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হয় না কেউ। সমগ্র গোষ্ঠীর যে পূর্বপুরুষ, তার সাক্ষাৎ বংশধরদের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ মাতব্বরেরা একে মনোনীত করে।

'তোরা কি বলতে চাস?' প্রতিটি বৃদ্ধ মাতব্বর একে একে ওর কাছে অভিবাদন জানাবার পর সর্দার প্রশ্ন করে। আগন্তুকেরা সবাই একটু সরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিজেরা ফিস ফিস করে পরামর্শ করে। তারপর সবার মাঝ থেকে ওপোকুর বাবা এগিয়ে যায়।

'বাবা, এরা সবাই, আমাকে এগিয়ে দিয়েছে বলতে—'

'বল্ ব্যাটা, বল্,' সর্দার অনুমতি করে।

'দেবী-বসুমতীর পাওনাগণ্ডা আমরা নিয়ে এসেছি বাবা। বছর ঘুরে আবার বীজ বোনার সময় এসে গেছে ত। ধান ও গম, ভেড়া ও ছাগল, মোরগ, গিনি-মুরগি ও মাছ—সবই এনেছি। বাইরের উঠোনে রয়েছে সব। নতুন বছরে কোন অঘটন যেন না ঘটে।'

'ভালোয় ভালোয় কাটে যেন বছরটা।' ঘাড় কাৎ করে সর্দার শুভেচ্ছা প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। শুধু মোরগগুলির ডানা ঝাপটা আর ভেড়া-ছাগলের ভ্যা ভ্যা শব্দ শোনা যায়। ভূস্বামীর অনুচরেরা ওগুলোকে সরিয়ে নেবার সময়েই আওয়াজ ওঠে।

'বাবা,' দলের মুখপাত্র বলে ওঠে, 'আমরা বড় ফিকিরে পড়েছি। বীজ বোনা হয়েছে, কিন্তু শুকনো মাটিতে জ্বলে গেছে সব। এছাড়া, আর একটা ব্যাপার ঘটেছে বাবা।'

'বল্,' জবাব করে সর্দার।

'বড় ঘাসের দেশের বিরাট জীব একটা ছোকরা আর একটা ছুকরিকে ঘায়েল করেছে। আগুনে পুড়েছে অনেক লোক। গুজব, বিষ বাণের তেজও কমে গেছে।'

'কোন্ বংশে ঘটেছে এসব ?'

'বাবা, সাত বংশের সব জমিনই বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেশ করছে। অন্য ব্যাপারগুলো এখন অবধি চিতাবাঘ আর সিংহ বংশের মাঝেই রয়েছে।

'জখম হয়েছে কারা ?'

'শিকারী ওপোকু, আর বাঘিনী কন্যে বিষবাণের ভাঁড়াড়ী আমালাগানে।'

'তাদের বাড়ীর কর্তারা কি করেছে ?'

'গণৎকারের কাছে গিয়েছিল !'

'দৈবী হয়েছে ?'

'দৈবী গণনায় বলছে, কোথাও কিছু অপবিত্র হয়েছে, আর মা-বসুমতীর বুকের উপর রক্তপাতও ঘটেছে।'

'মোড়লদের কি ইচ্ছে ?'

'আমরা দু ভাগ হয়ে গেছি বাবা। কারুর ইচ্ছে যে সাত গুষ্টি জমায়েৎ হোক, আর প্রত্যেকটি ডাগর ছেলে ও মেয়েকে পরখ করা হোক। অন্যেরা বলছে, শুধু চিতাবাঘ এবং সিংহ বংশের ছেলে মেয়েদেরই পরখ করা হবে। আর একদলের মত, জখমি ছেলেটা ও মেয়েটাকেই শুধু ডাকা হোক।'

'যারা নিজেরা দোষ করে, তাদের দেবতারা আগে মারে,' বলে সর্দার।

'আঃ,' চিতাবাঘ জাতের যারা উপস্থিত ছিল তাদের ভিতর থেকে ধ্বনি ওঠে।

'তোরা বলছিস যে সিংহী যাকে ধরেছিল, সে মেয়েটা হল পেন্টিয়ার বিষ বাণের পুরুত ?'

'তা ঠিক বাবা ; কিন্তু ওর ত ছেদন এসে গেল, এখন ও বিয়ের যুগ্যি। আর এক জনের হাতে ত পুরুতগিরির কাজ তুলে দিতে হবে।'

'ছেদনের সময়ই ত সবাই জানতে পারবে ও সাচ্চা কুমারী কি না।' বলে সর্দার।

'তা জানবে বাবা।'

'যদি ওকে কুমারী বলেই জানা যায়, তাহলে ওকে কোন দোষে দোষী করা চলবে না।'

'না, তা চলবে না।'

'মা-বসুমতীর বুকে রক্তপাত ঘটিয়েছে কে '

'তা কেউ জানে না। সিঙ্গিটার হাতে ছাড়া কেউ জখম বা খুন হয়েছে বলে জানা নেই।'

'আগুনে পুড়ে শাস্তি পেয়েছে কারা ?'

'সাতগুষ্টির সব গুষ্টি থেকে এক একজন পুড়েছে।'

'তা হলে দেবতারা যাদের উপর অভিশাপ ছেড়েছে, আর তার জন্য যারা দায়ী, তাদের সবাই পরীক্ষার জন্য বিষ পান করবে কি ?'

'আমরা তা বলিনি ত বাবা।'

'সবাই যদি বিষ খায়, অনেকেই মরবে। নয় কি ?'

দুশমন সব খতম না হতে পারে, কিন্তু মড়ার হিসেব করা যাবে না।'

'গেল আবাদের সময় কুঞ্জে বলি দেবার আগে বৃষ্টি হয় নি।'

'আপনি ঠিক কথা বলেছ বাবা।'

'ছেদনের পর জানা যাবে কোন্ কোন্ কুমারী মান খুইয়েছে।'

'তা জানা যাবে।'

'সবাই জমায়েত হয়ে সারা গুষ্টির কি ইচ্ছে, তাই ঠিক কর্ তাহলে।'

সর্দারের কথা ও বলার ভঙ্গীতে কোথাও অভিযোগ প্রমাণ বা খণ্ডনের চেষ্টা নেই। যারা সিদ্ধান্ত করবে তাদের বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়া আর যথাযথ নির্দেশ দেওয়াই তার দায়িত্ব। বিজ্ঞ বিচারকের কর্তব্য তাঁর।

অগত্যা এগিয়ে আসে কুলবৃদ্ধ।

'বাবা, আমরা মত করেছি : কুঞ্জে পূজা ও বলি তক্ আমরা চুপ থাকবো। ছেদন পর্যন্ত দেখব। আপনি যদি ভাল মনে করো ত এই আমাদের মত।'

'তোরা যা বলছিস, আত্মাদের কাছে আমি তা নিবেদন করব। তারা যদি রাজী হয়, তা হলে তোদের মতই চলবে। এখনকার মত সবাই যে যার বাড়ী যা। বাপকে জানাস সব, আর তার মন্দিরে সাদা মোরগ বলি দিস একটা করে।'

এক এক করে উঠে সারি বেঁধে পর পর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ওরা। শেষ লোকটি উঠে যাবার পর ছেলের দিকে ফিরে তাকায় সর্দার। কথা বার্তার সময় আগাগোড়া পাশে বসে ছিল ছেলেটা। সহৃদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে সর্দার মন্তব্য করে :

'আকাশ থেকে ছোঁ মেরে নেমে আসে বাজপাখী। বলে, একটা মানুষ ধরতে যাচ্ছি। আর দেখ্, শেষ পর্যন্ত একটা মুরগি নিয়ে পালায়।'

'হ্যাঁ বাবা,' বিজ্ঞ পুত্র উত্তর করে, 'কিন্তু মুরগির যদি নেশা লেগে থাকে, বাজপাখীকে ডরায় না সে।'

নবম অধ্যায়

নৃত্যোৎসবের পর চৌদ্দ দিন গত হয়েছে। কাল প্রতিপদে নতুন চাঁদ দেখা দেবে। এরই প্রত্যাশায় ছিল সবাই। পুণ্যকুঞ্জে যে অনুষ্ঠানের ফল বৃষ্টিপাতের আশা, কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদে তা করা সম্ভব হয় নি। তারা চায় বাড়বাড়ন্ত, তাই বাড়তি চাঁদই তাদের কাম্য।

এই কদিনের মধ্যে ওপোকু আমালাগানেকে দূর থেকে চকিতের দেখা দেখেছে শুধু। একদিন আমালাগানে জলের হাঁড়ি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছিল নদীর দিকে। আর একদিন দেখেছিল তাকে জ্বালানি কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরতে। সঙ্গে ছিল গুটিকয় ছোট মেয়ে, শিশু বললেই হয়। ওরা প্রত্যেকেই এক একটা কাঠের আঁটির বোঝায় টলতে টলতে চলছিল। এদের জীবনে বয়স্করা সব সময় যে সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেই কাজের মধ্যে এটা-সেটা করাই শিশুদের একমাত্র খেলা। শুধু বড়দের সাহায্য করা নয়, শিশুরা এর ফলে অজান্তে ঘরের কাজে পাকা পোক্ত হয়ে ওঠে।

এই দুবারই ওপোকু আমালাগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেছে। তার সঙ্গে কথা কইতে চায় না বলে নয়; কিন্তু আমালাগানের সঙ্গে তাকে কেউ দেখে ফেলুক—এটা চায় না ওপোকু।

আমালাগানে সম্পর্কে নানা গুজবের খবর ও জেনেছে। সে সব গুজবে অবশ্য এ পর্যন্ত আমালাগানের নামের সঙ্গে ওপোকুর নাম জড়ায় নি। শুধু নিরস্ত্র অবস্থায় সিংহীর কবল থেকে তাকে মুক্ত করে আনার কাহিনী ছাড়া। বিপদে সহজ প্রবৃত্তির বশে এমন দুঃসাসিক কাজ যে সমাজে স্বাভাবিক বলে বিবেচিত, তাদের মনেও ওপোকুর এই অসমসাহসিকতা রেখাপাত করেছে।

ওর নিজের ক্ষতগুলি একেবারেই সেরে গেছে, গালের ও বুকের উপর দুটো সাদা দাগ রয়ে গেছে—এই যা। কিন্তু মনের ঘা এখনো দগ্‌দগ্‌ করছে। ওর বাবা এবং মোড়লরা ব্যাপারটার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছে, সে সবই শুনেছে ওপোকু। দোষী বা নির্দোষ যাই হোক না কেন, আমালাগানে যে পর্যন্ত না বাঘিনী কন্যার পদ ছেড়ে দিচ্ছে, আর ছেদন পর্বও সমাধা না হচ্ছে, সে পর্যন্ত ওকে রেহাই দেওয়ারই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ ছেদন হয়ে গেলেই সবাই জানতে পারবে, ও সত্যি কুমারী আছে, না মান খুইয়েছে।

আজ রাতে নিশ্চাঁদ অমাবস্যায় ওই দুটোর মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠানটি সমাধা হবে। তরুণ যোদ্ধা হিসেবে ওপোকুকে হাজির থাকতেই হবে সেখানে, দেখবে অনুষ্ঠান, রূপসীকে স্পর্শও করবে।

ও জানে, অবস্থা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সঙ্গীন হয়েছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি, তবু কুমারীত্ব ভঙ্গ করার অপরাধের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক কলুষিত করার গুরুতর অভিযোগও অচিরেই জুড়ে দেওয়া হবে। কুমারীত্ব ভঙ্গ অপরাধ হলেও তা এমন দুর্ঘট কিছু নয়।

আধুনিক সভ্যসমাজের হিসেবে ওপোকু বা আমালাগানের বিশেষ ভয়ের কিছুই নেই। কোন লোক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসবে এমন আশঙ্কা মোটেই নেই। বরং যদি সাক্ষী হতে কাউকে ডাকা হয়, সে নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলেই জাতীয় নীতি রক্ষা করবে। 'প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কখনো সাক্ষ্য দেবে না,' এই ওদের নীতি। সাক্ষ্য সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন। এ নীতির মূলে হয়ত আছে আত্মরক্ষারই তাগিদ। কারণ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য দেবে সে 'টুকো' হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে অপরাধীর মৃত্যুর উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে, অবশ্য যেখানে মৃত্যুই অপরাধের দণ্ড। 'খুনে'র খুনী হওয়াও ওদের চোখে পরম অসামাজিকতা এবং মহাপাপ।

সভ্য সমাজের লোক হয় ত এ হেন সমাজের আসামীকে ঈর্ষা করবে। বলবে, 'বেড়ে মজা ত, সাক্ষী না হলে ত বেকসুর খালাস।' কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। নিজের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পায় না অপরাধী। আত্মা বা দেবতার দল তাকে শাস্তি দেবার আগেই বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে জর্জর হয়ে যাবে সে। শুনবে বন্ধুকে সাপে কামড়েছে; প্রতিবেশীর শিশুকে আমাশায় কি জ্বরে মারা যেতে দেখবে; চোখে পড়বে শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হয় ত লোকে বলাবলি করছে কোথায় কোন্ দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ওর মনের ভিতরটা দগ্ধে যাবে এই বিশ্বাসে যে, ওর পাপের ফলেই ঘটছে যত সর্বনাশ! যা-কিছু অমঙ্গল ঘটে, ওদের চোখে তা নিষ্ঠুর বিধাতার অনিবার্য অবিচার নয়, নিজেদের কৃতকর্মেরই ফল। চারিদিকের দুর্ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বেঁচে থাকার অসহনীয় জ্বালায় জীবন বিষিয়ে উঠবে। যত বড় পাকা পাপীই হোক না কেন, অনুশোচনার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে সে। পুলিশ, উকিল, আদালত—কোন কিছুই লাগবে না। ন্যায়ের জয় আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হবে। বিষপানের পরীক্ষায় দোষ প্রমাণের অপেক্ষা থাকবে না। নিজের বিবেকের চাপে এমনভাবে দম বন্ধ হয়ে যাবে অপরাধী যে, তার তুলনায় বিষ হবে জলের মত সহজ পানীয়।

এই ধরনের অনুশোচনাতে ছিন্নভিন্ন বিবেক নিয়েই দিন কাটছিল ওপোকুর। যদি শুধু নিজের ব্যাপার হত, তবে ও স্বীকার করত সব অপরাধ। বিবেকের বন্যার বাঁধ খুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেত। কিন্তু যে মেয়েকে ভালবাসে, তাকে অপরাধী না করে ওর ত শাস্তি পাবার কোন উপায় নেই!

ওপোকুর আজ প্রধান কর্তব্য রূপসীকে রক্ষা করা। ছেদনের দিনে যাতে ওর আসল অবস্থা প্রকাশ না হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থাটা এমন কঠিন কিছু নয়। সময় মত ছেদনকারী পোকুবুগাকে

ঘুষ দিয়ে কার্যোদ্ধার হয়েছে, এমন ঘটনা ওর শোনা আছে। তারপর কুঞ্জে বলিদান ও প্রার্থনার ফলে যদি বৃষ্টি হয়, অবাঞ্ছিত আর কোন ঘটনায় বিব্রত না হয় পল্লী বা গোষ্ঠী, তা হলে বিষপানের পরীক্ষা দ্বারা অপরাধীকে শাস্তিদান করে আসন্ন অভিশাপ ঠেকাবার যে সর্বসাধারণের দাবি, তা হয় ত এড়ানো যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যায় সব।

আমালাগানেকেও কষ্ট পেতে হয়েছে, কিন্তু সে জ্বালা মনের জ্বালা নয়। দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হয়ে সেদিন যে বিপদ ঘটিয়েছিল তার জন্য মনের ধাক্কা কেটে গেছে। ছোট মাদুরটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে সারা রাত ধরে ভাবতে বেশ লাগে, কি ঘটেছিল সে রাতে। মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, ওর প্রিয়তম আঁধার ঝোপের ভিতর দিয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দেহটি উদ্ধার করতে। কোন অস্ত্র নেই সঙ্গে, নিজের বাহু ও দাঁতই শুধু সম্বল। অনুশোচনা জাগে মনে, কেন ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা সব সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে কি ভালোই না লাগত!

সমাজ ও আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গেছে রূপসী। অভিযোগের ফল কি হবে তাও গ্রাহ্য করে না। পৃথিবীর, নদী-বন-আকাশের, কোন কিছুকেই ও মনের কামনার অন্তরায় হতে দেবে না।

মন স্থির করে ফেলেছে রূপসী, কোন দূর দেশে পালিয়ে যাবে প্রিয়তমকে নিয়ে। যাবে সেই দেশে, যেখানে মানুষের তৈরী বাধা নিষেধকে অগ্রাহ্য করে প্রেমিক-প্রেমিকা নির্বিবাদে মিলিত হতে পারে। ও ত শুনেছে, যে কোন এক জায়গার আত্মা এবং দেবতাদের ক্ষমতা তাদের গণ্ডীর বাইরে আর খাটে না। এলাকার বাইরে নির্বীর্য হয়ে যায় তাদের শক্তি। যত বড় লম্বা গলা বা লম্বা ঠোঁটই হোক না কেন ধনেশ পাখীর, নদীর এপারে খাবার সংগ্রহ করেই তাকে তৃপ্ত হতে হবে—এ প্রবাদও শুনেছে ও।

ডাইনী আর প্রেতাত্মারাও নিজ নিজ হদ্দার বাইরে কিছুই করতে পারে না। আকাশ-দেবতা এবং মা-বসুমতী অবশ্য সর্বশক্তিমান, তাদের শক্তি ও গতি অবাধ, সব দেশে সব সময়ে তারা যেতে পারে। কিন্তু ওপোকু বীর, শিকার করে এনে অনেক রসাল বলিদানে তাদের অপরিসীম ক্ষুধাও শান্ত করতে পারবে। হ্যাঁ, তা-ই হবে। ছেদনের আগেই পালাবে ওরা।

আমালাগানে মজ্জায় মজ্জায় বিপ্লবী। আর সংস্কারের কাছে আত্মবলি দেয় যারা, ওপোকুর মনের গঠন তাদের জাতের।

বিষ তৈরী হবার আগের দিন। ওপোকু এবং আর যারা তীরে বিষ মেশাবার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে, সবাই বনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হয়ে যায়। তিনটি মাত্র নারী যায় এ দলে—আমালাগানে, সন্তান-ধারণের বয়স পার-হয়ে-যাওয়া এক বুড়ী, আর একটি তরুণী, যে নতুন বাঘিনী কন্যা হবে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার করা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। কে জানে কার পায়ের চাপে সেখানকার কঠিন মাটি গুঁড়ো হয়ে আছে। কোন মতে খানকয়েক পাতার কুঁড়ে বাঁধা হয়েছে, মেয়ে এবং পুরুষের জন্য আলাদা করে। নির্বাক ও উপবাসী থাকতে হবে সবাইকে— এই নিয়ম।

স্ট্রোপান্থাসের ছড়া গুঁড়ো করার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকেছে মেয়েরা। শী-গাছ থেকে মাখন বানিয়েছে। ঠিক করেছে সাপের বিষ। আর আর যা-কিছু মেশানো হবে বিষের সঙ্গে, তাও যোগাড় করেছে।

মেয়েদের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ রাখে নি মরদরা। রাতের আগ পর্যন্ত তাদের সময় কেটেছে তীর বানিয়ে, ধনুক বেঁধে। তূণও বানিয়েছে।

অনুষ্ঠানের আগে মেয়ে পুরুষকে একেবারে আলাদা থাকতে হয়। সংযম রক্ষার জন্যই এইসব বিধিবিধান।

যে পেন্টিয়া মন্দিরের সেবাইত এবং পূজারিণীর পদ থেকে আমালাগানে আজ অবসর গ্রহণ করবে, তা আর কিছু নয়, প্রধানত স্ট্রোপান্থান দিয়ে তৈরী এক পাঁচমিশেলী বিষের আধার, কালো মাটির একটা হাঁড়ি।

সভ্য সমাজের বিজ্ঞানীরা স্ট্রোপান্থাসের নাম শোনার বহু যুগ আগে থেকেই আফ্রিকার বস্তিরা তার খবর জানে। এই সাংঘাতিক বিষ হৃদয়ের উপর মারাত্মক ক্রিয়া করে। আফ্রিকাবাসীরা কিন্তু স্ট্রোপান্থাসের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ধার ধারে না। তারা জানে এই লতায় মহাশক্তিধর এক দানা ভর করে থাকে। তাকে প্রসন্ন করতে পারলেই খুশী হয়ে সে ভক্তদের কাজে লাগাবে নিজেকে।

রোগ এবং দাওয়াই সব কিছুরই এই গোপন রহস্য ও মূল তত্ত্ব। দুর্বল হৃদপিণ্ডকে সবল করার কাজে ওরা ব্যবহার করে না স্ট্রোপান্থাস ছড়া। গুঁড়ো করে, সিদ্ধ করে, মন্ত্রে ও প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করে নিয়ে, তারপর তীরের ফলায় তাই মাখায়। শত্রু ও শিকার দুয়েরই মৃত্যু তাতে অবধারিত।

অধিকাংশ দেও-দানার মত স্ট্রোপান্থাসের দেবতারও নিজস্ব মন্দির আছে। তারই নাম পেন্টিয়া। আর তার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে একজন পুরোহিত। অন্যান্য দেও-দানার মত এরও নিজস্ব বিধিনিষেধ আছে। তা লঙ্ঘন করলে সে তার শক্তি প্রত্যাহার করবে, কোন প্রয়োজনে আসবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিরাট হাতীকে মেরে ফেলতে পারে যে মহাশক্তিমান দেবতা, তার দাবি, যে পূজানুষ্ঠানের সময় তার সেবাব্রতেরা অপবিত্র অবস্থায় কেউ আসতে পারবে না। আর পূজারিণী যে, সেও হবে খাঁটি কুমারী। সমগ্র গোষ্ঠীর জীয়ন কাঠি ও মরণ কাঠি যে বিষাক্ত তীর,

চিতাবাঘ সমাজ তার অনুগ্রহ লাভ করবে যার মারফতে, অক্ষত কুমারীত্বই হবে তার প্রধান সাধনা। তাই সে হল সমাজের বাঘিনী কন্যা।

পরী ও বুনো দানবদের বাথান এই গহন বনের সাময়িক আস্তানায় অবশেষে রাত নেমে আসে। শত শত অদ্ভুত শব্দ ও স্বর মাঝে মাঝে সহসা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিসের যেন শঙ্কা জাগিয়ে তোলে এই হঠাৎ-নৈঃশব্দ্যের ভয়াবহতা। মনে হয়, বনের যত প্রাণী সবাই একসঙ্গে শ্বাসরোধ করে চিত্রবৎ হয়ে গিয়েছে, আর কে যেন নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে তারই ভিতর দিয়ে। এই মুহূর্তে, বনের এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, একক মানুষের সব চেয়ে শঙ্কা, পাছে নিজের আর্ত চীৎকার এই ভয়াবহ রহস্যময় নিস্তব্ধতার বুক চিরে দেয়। তারপর হঠাৎ হয় ত কোন সিংহ গর্জে ওঠে, ঘোৎ ঘোৎ করে চিতাবাঘ, হা হা করে অট্টহাস্য করে হায়েনা, শুরু হয় ঝিঁঝির একটানা ঐক্যতান; কিংবা কোন অতি সাহসী ব্যাঙ নিথর বায়ুতরঙ্গ কাঁপিয়ে গ্যাঙর গ্যাঙর শুরু করে দেয়। ভেঙ্গে যায় নিস্তব্ধতার উত্তেজনা, আর জীবজগৎ—পোকা, পাখী, সরীসৃপ, চতুষ্পদ, এমন কি, উদ্ভিদকুল পর্যন্ত—আবার সচল হয়ে ওঠে। শুরু করে তাদের নিত্য ক্রিয়া, প্রেম হিংসার সংঘাত, হয় ত নিছক টিকে থাকার সংগ্রাম।

মাঝ রাতে হঠাৎ খরর্ খরর্ করে মোটা কাঠের খঞ্জনি গর্জন করে ওঠে। এই যন্ত্রকে ওরা বলে হায়েনার ফেউ। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে তা প্রতিধ্বনি তোলে। কোন-মতে-বাঁধা ঘেসো কুঁড়েগুলির বেড়ার ফাঁক দিয়ে চকিতে ঠিকরে পড়ে আলো। তারপর নিঃশব্দে স্থিরপদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে পুরুষের দল। বাইরে এসে খোলা জায়গাটিতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের পায়ের চাপে মাটি কচ্‌মচ্‌ করতে থাকে।

একটা লোক বেরিয়ে আসে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি নিয়ে। তারপর

সেইটে থেকে বাইরের স্তূপাকার করে সাজানো কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হঠাৎ জলে-ওঠা বিরাট আগুনের চোখ-ঝলসানো দীপ্তির মধ্যে দেখা যায় ছায়ার মত দণ্ডায়মান পূজারিণী আমালাগানের দীর্ঘ ঋজু দেহ, সম্পূর্ণ আবরণহীন। পাতার আচ্ছাদন, কোমরের দড়ি, ধাতুর তৈরী অলঙ্কার —সব কিছু বিদূরিত হয়েছে তার দেহ থেকে। বুড়ী বসে আছে ঠিক ওর পিছনে, মাটির উপর। হাঁড়ি-মন্দিরটা দু ঠ্যাং-এর ফাঁকে নিয়ে আছে। আর তার পাশেই বসে আছে বছর বারোর একটি মেয়ে। ছোট্ট তার দেহ, কিন্তু যেমন কমনীয়, তেমনি অনবদ্য তার গড়ন। একটা স্ট্রোপান্থাসের ডাল হাতে নিয়ে বসে আছে নবনির্বাচিত সেবায়েত, সে হবে নতুন বাঘিনী কন্যা।

হঠাৎ একটা লোক দলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অদৃশ্য মৃত আত্মাদের প্রতি আহ্বান জানায়ঃ

"এই তীরগুলি তোরা যেমন বানাতিস, মোরাও তেমনি করে বানাতে চাই।"

তারপর জীবিতদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলেঃ

"যদি কেউ থাকিস যে কখনো চুরি করিস,
যদি কেউ থাকিস যে পরের বউ নিয়ে ভোগ করিস,
যদি কেউ থাকিস নোংরা,
যদি কেউ পড়শীর খেতি হওয়া ইচ্ছে করিস

এমন যারা আছে, তাদের বিষ না-মাখানো তীর নিয়ে এখনি তারা আগুনে ফেলে দিক।"

এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার তৈরী তূণের গায়ে তীরের ঘটর ঘটর শব্দ শোনা যায়, সবাই টেনে বার করে তীরের গোছা।

রূপসী বাহু-যুগল প্রসারিত করে দেয়।

সারি থেকে প্রথম লোকটি ছুটে বেরয়, ফলাগুলো সোজা করে তীরের গোছাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে। পূজারিণী গ্রহণ করে সেগুলো। তারপর গুছিয়ে নিয়ে অল্প ফাঁক করা দু পায়ের মাঝখান দিয়ে পিছনে বুড়ীর কাছে তা চালান করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী তীক্ষ্ণ ফলাগুলি ডুবিয়ে দেয় হাঁড়ির মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্য পুরুষটি পূজারিণীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়। তারপর যেমন ভাবে গিয়েছিল তীরগুলি, ঠিক তেমনি ভাবে তা ফিরে আসে। মারাত্মক বিষে সত্তসিক্ত তীরের ফলাগুলি রূপসীর জঙ্ঘা প্রায় চুম্বন করে চলে। তীরগুলি বুকের উপর চেপে ধরে পূজারিণী, তারপর দু হাতে ধরে পুরুষটির হাতে এগিয়ে দেয়। অঞ্জলি পেতে শ্রদ্ধার সঙ্গে তীরের গোছা গ্রহণ করে সরে যায় পুরুষটি।

ওপোকু অপেক্ষা করেছিল। এবার তার পালা। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গিয়েছে, হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। আনুষ্ঠানিক আলিঙ্গনের সেই পরম মুহূর্তে একটি শব্দ তার কানে বাজলো—জাবা (প্রিয়তম)! দীর্ঘশ্বাস থেকে পৃথক করা চলে না সে উচ্চারণ। তীরগুলি ফেরত নেবার সময় ওপোকুর কম্পমান হাত থেকে একটা পড়ে গেল নরম মাটির উপর, আমালাগানের পা থেকে এক সুত দূরে। নির্ভয়ে সপ্রতিভভাবে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা আমালাগানে, তারপর ধীরে তা অর্পণ করল ওপোকুর প্রসারিত হস্তে।

সব শেষ তীরগুলি বিষ মাখানো হয়ে গেছে। এবার বুড়ী উঠে দাঁড়ায়, তারপর নবনির্বাচিত সেবায়েতকে ইশারায় ডাকে। স্ট্রোপান্থাসের ডালটা হাতে ধরে এগিয়ে আসে মেয়েটি। তারপর ডালটা নিয়ে রূপসীর গা ঝাড়তে থাকে—কাঁধে, বাহুতে, পায়ে; আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহেও বুলিয়ে নেয় সেটা। এমনি করে বিষের আত্মার শক্তি আমালাগানেকে ছেড়ে ওর দেহে সঞ্চারিত হয়।

দশম অধ্যায়

তীরে বিষমাখানোর অনুষ্ঠান ও পেটিয়া মন্দিরের নতুন সেবায়েতের অভিষেক ভালোয় ভালোয় সমাধা হয়ে গেছে। কোন দুর্ঘটনাই ঘটেনি। এই উপলক্ষ্যে যারা বনে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে গ্রামে। দিনরাত উপবাস ও সংযমের পর যারা খাবে, তাদের জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে খাবার তৈরী করতে লেগে যায় গিন্নীরা।

ওপোকুর এখন প্রধান চিন্তা, শিকারে চলে গিয়ে নতুন বিষ-বাণের শক্তি পরীক্ষা করে আসতে হবে। ও বেশ জানে, এই শক্তির উপর ওর এবং আমালাগানের ভবিতব্য নির্ভর করছে। ওপোকু পুণ্যকুঞ্জের অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষা করবে। সেখানে ওর যেতেই হবে তা নয়, তবুও উপস্থিত থাকবার মনস্থ করেছে। কারণ, এই ঘটনার উপরও ওদের ভাগ্য অনেকখানি ঝুলে আছে। বর্ষা যদি নেমে যায়, অর্ধেক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় তাহলে।

খাওয়া সেরে ওপোকু ঘুরে বেড়ায়। কুঞ্জের দিকে যাবার জন্য যারা এরই মধ্যে তৈরী হয়ে আছে, তাদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করে।

সময় মেনে চলবার বাধ্যবাধকতা সবার জন্য নয়। যে কেউ-কেটা লোক, সে আর পাচজনকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, এ-ই রেওয়াজ। তাই মোড়লবৃন্দ পরিবৃত হয়ে সর্দার যখন এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল, সূর্য তখন অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। মেয়েছেলে কেউ নেই সঙ্গে। ওরা নাকি অকৃতজ্ঞ জাত, অন্তত একদল তাই বলে। অনেক কাজে মেয়েরাই অবশ্য প্রধান, কিন্তু আত্মার পূজা ও পরিতৃপ্তির অনুষ্ঠানে তাদের কোন সক্রিয় অংশ নেই, পুরুষের হাতেই সব ভার।

এবার সবাই মিলে রওনা হয়। একজন একটা ভেড়াকে হেঁচড়ে

টেনে নিয়ে চলে। একজনের মাথায় একটা ছোট পচাইয়ের হাঁড়ি। আর একজন চলেছে একটা ভাঙ্গা সরায় করে একটুকরো জ্বলন্ত আনিয়াঙ্কামা কাঠ নিয়ে।

চারদিকে কুঁড়েঘর। তার ভিতর দিয়ে একে বেঁকে এগিয়ে চলে দলটা। একটা নিচু পাঁচিল ঘেরা উঠোনের মধ্যে আমালাগানেকে একবার চোখে পড়ে ওপোকুর। উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল রূপসী। এক হাতে তার ঘাসের তৈরী একটা ঝাঁটা, আর হাতে একটা তরমুজের ভাঙা খোলা, ঝাঁট দেওয়া ধুলোময়লা ফেলার আধার। গতরাত্রের পরিশ্রম সত্ত্বেও আমালাগানেকে বেশ সতেজ ও প্রফুল্ল মনে হয়, যেন কিছুই হয়নি। গুন গুন করে গানও গাইছিল। তার কয়েকটা কলি ধরতে পারে ওপোকু:

কখনো এখানে কখনো ওখানে ঘুরে বেড়ায় কে?
সে কি আমি নই, নই আমি, ওকা আবেনা?
কখনো লাফাই উঁচু হয়ে, ফের আঙুলে দাঁড়াই ভর করে,
যদি দেখা তোর পাইরে।
পায়ের পাতায় তুলে নেই আমি আবুরুবোবার গুটি;
আবেরেফি সেম্পা গো!
তুই হবি কি আমার বঁধু?

ওরা এগিয়ে চলে, পার হয়ে যায় ভাঙা হাঁড়িকুড়ির আস্তাকুড়। ভূতুড়ে ঝোপও পিছনে ফেলে আসে। যে সব শিশু মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে মরে, অথবা আঁতুড়ে মারা যায়, তাদের শব ফেলে দেওয়া হয় এই ঝোপে। অবশেষে তারা এসে পৌঁছয় একটি ছোট কুটীরে। এ্যাকাসিয়া-তলা বলে এটাকে সবাই। ঘন অরণ্যে ঢাকা একটা তরাইয়ের একেবারে নিচু অংশে অবস্থিত এই কুটীরটার বাসিন্দা মাত্র একজন, তাকে বলা হয় কুঞ্জরক্ষক। এই কুঞ্জের তদারকির ভার তার ওপর। ও-ই আত্মাদের অনুচর

এবং এই কারণে সে একটা কেউ-কেটাও বটে। সর্দারের দাসও ত সর্দার!

কুটিরের দরজার বাইরে মেটে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়ানো একখানা পাথরের শিল। তার তিনদিকে কঞ্চির বেড়া, অতি উৎসুক ছাগগুলোকে যাতে ঠেকানো যায়। এই বিশেষ দেবতাটির কাছে ওই জীবটি অতি অপবিত্র।

কুঞ্জরক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে সর্দারকে অভিবাদন করে। সর্দার পচাইবাহককে ইঙ্গিত করতেই সে খানিকটা পচাই ঢেলে দেয় সেবাইতের হাতে-ধরা তরমুজের খোলাটার মধ্যে। সেবাইয়েত তখন পাথরখানার কাছে এগিয়ে যায়, তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে পচাই ঢালে তার উপর, মুখে মন্ত্র আউড়ে চলে। উচ্চারণ একেবারে সুস্পষ্ট :

তোর ডেরায় ঢোকার পথ বড় ভয়ানক,
তোকে যখন কেউ ধ্বংস করতে আসে, তুই ধ্বংস হসনা তাতে!
মানুষ যেখানে তোর সাথে দেখা করতে আসে,
সত্যময় ঈশ্বরের ঘণ্টা সেখানে বাজে ঢং ঢং করে।
আর কোথাও যদি গিয়ে থাকিস ত ফিরে আয় এখানে।
নদীতে যখন বন্যা আসে, তখন লোকে তোর শরণ নেয়,
ক্ষেত যখন জ্বলে যায়, তখন লোকে আসে তোর কাছে।
আকাশের উল্কা তুই, পরমপুরুষের সঙ্গে তোর বাস।
অনেক দূর ছড়ানো টানায় সুতো বুনিস তুই।
আমরা তোর মুখ দেখতে চাই, আয়, এখানে আয়!
আমাদের নিবেদন শোন্ এসে।

একটুকাল থেমে আবার বলে চলে :

আকাশ-দেবতা, তোর গায়ে হেলান দিয়ে মানুষের পতন নেই।

দেবী বসুমতী, তোর উপর আমরা বিশ্বাস রাখি।
আয় আয়, এই পচাই নে, পান কর্।
তোকে আগে জানানো আমাদের উচিত;
তোর কাছে যাবার পথ যাতে পায় ওগুলো।
কোন দুর্ভাগ্য যেন না ঘটে এদের:
শিকারীরা যেন শিকার করতে পারে;
বৃষ্টি যেন হয়;
মেয়েরা যেন বাচ্চা পয়দা করে;
আমাদের চোখে যেন বাধা না পড়ে;
কান যেন বাধা না পায়;
আমরা এখানে যারা মিলেছি, সবাই যেন বেঁচে বর্তে থাকি।

প্রাথমিক অনুষ্ঠান সাঙ্গ করে দলবল এবার চড়াই পথে অগ্রসর হয়। কোন পথ আর দেখা যায় না। মাথার উপর ঘনবদ্ধ গাছের চাঁদোয়া সূর্যালোকের প্রবেশ রুদ্ধ করে রেখেছে। এখানে সেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। একজন মন্ত্র পড়তে শুরু করে:

আমাদের পথ করে দে,
যে-কোনখানে যে-কোন রকমের পথ—
দে একটা আমাদের …
আমরা এসেছি
এসেছি আমরা—

হঠাৎ চোখে পড়ে একটা বড় গাছের গোড়ায় কতকগুলি পাথরের ঢিপি। মোটা মোটা শিকড়গুলি মাঝে মাঝে ঢিবিগুলোর গায়ের উপর নেমে এসে জড়িয়ে ধরেছে সেগুলোকে। বিরাট গুঁড়িটার মাথায় আকাশ-ঢাকা পাতার চাঁদোয়া, গাছের ডগাটা দেখাই যায় না। এই মহীরূহের গোড়ায়

একটা দুভাগ হওয়া শিকড়ের মাঝখানে রয়েছে ছোট কালো রঙের মেটে থালা একটা, খৃষ্টানগীর্জায় গম্বুজের নিচেই যেমন বাটি থাকে, তেমনি।

সর্দার-ভূস্বামী এগিয়ে আসে, তারপর পাত্রটার উপর ঝুঁকে পড়ে বলতে শুরু করে ঃ

হে দেবগণ, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
হে ভূত প্রেত দেও দানা, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
হে বৃক্ষ ও লিয়ানা লতা, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
নদী ও হ্রদের দেবতা, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
হে পূর্বপুরুষদের আত্মা, তোমরা এস, আমাদের বলি গ্রহণ কর।
হে দেবী বসুমতী, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
হে পরমেশ্বর, এস আমাদের বলি গ্রহণ কর।
আমরা বারতা পাঠিয়েছি, তা নিশ্চয়ই শুনেছ ঃ
পৃথিবী জ্বলছে, জমিতে আগুন লেগেছে,
মাটির বুকে বীজ শুকিয়ে মরছে।
দয়া কর,যেন বৃষ্টি হয় !

উপস্থিত সকলে একটা করে ছোট ডাল ভেঙে মদের পাত্রে তা ডুবিয়ে নেয়। তারা সেটা নেড়ে নেড়ে ফোঁটা ছড়াতে ছড়াতে সুর করে বলে চলে ঃ

এক টুকরো সাদা মেঘ পাখীর মত ভাসে।
সাদা মেঘের টুকরো,
ছোট্ট মেঘের টুকরো,
এই মেঘ থেকে যেন বৃষ্টি ধারা আসে।
দে দে জল।
বুক গেছে শুকিয়ে

মন গেছে শুকিয়ে

দে আমাদের জল—

ভেড়াটাকে সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে শক্ত হাতে পাত্রটার উপর ধরা হয়। তারপর ওর গলাটা কেটে দিতেই পাত্রটার মধ্যে রক্ত বেয়ে পড়ে। ভূস্বামী আবার প্রকৃতি ও মৃত আত্মাদের আহবান শুরু করে—তারা যেন এসে পান ও ভোজন করে।

এই সহজ সরল প্রার্থনায় ওপোকু অভিভূত হয়ে পড়ে। কথাগুলি বলার মধ্যে কোন তোষামোদের সুর নেই, ঠিক যেন একজন আর একজনের সঙ্গে কথা কইছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় সভ্য জগতের লোকেরা যে ঢং করে বাক্য উচ্চারণ করে, আফ্রিকার বন্য মানুষ তা শেখেনি।

সেই রাতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। দারুণ অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎঝলকে মুহূর্তের জন্যও ছেদ পড়ে না। খড়ো চালগুলি হু হু করে উড়ে চলে আকাশে।

সকালের আগেই তুফানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ঘূর্ণি ঝড়ের বৃষ্টি শান্ত হয়ে ঝির ঝিরে শীতল ধারায় পরিণত হয়। সারা বন কুয়াশা কুণ্ডলীতে ভরে ওঠে। মনে হয়, সারা পৃথিবীটাই যেন বাষ্প উদ্গীরণ করছে।

একাদশ অধ্যায়

বৃষ্টি ! ঈশ্বরের পরমতম দান, জীবজগতের প্রতি বিশ্বনিয়ন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। জীবের জীবন ধারণের প্রাথমিক উপাদান। এই বৃষ্টির অনিশ্চয়তার খেয়ালে বিব্রত হয়েই আকাশের ঊর্ধলোকে পরমপুরুষের কল্পনা করেছে মানুষ, যে পরমপুরুষ খুশী হলে বৃষ্টি ঢেলে দেন, রুষ্ট হলে দেন হয় অতিরিক্ত বৃষ্টির অভিশাপ, নয় অনাবৃষ্টির দাহ।

ইচ্ছাময় বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের মহান কল্পনা মহাপুরুষ ও মনীষী, মুনি ও ঋষি, কবি ও দার্শনিকদের আবিষ্কার নয়। যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস করেছে, তার সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করে তবে বেঁচে থাকতে হয়েছে যাকে, দেহ যার ছিল অনাবৃত, তারা-ভরা আকাশের নিচে মুক্ত প্রান্তরে যাকে ঘুমোতে হয়েছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে-ই প্রথম সচেতন হয়েছিল। চোখের সামনে নদী শুকিয়ে গিয়েছে, তারপর আবার সেই নদী ছুটেছে প্রবল বেগে, কলকল্লোল বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে। বাজ পড়ে বিরাট মহীরূহ চৌচির হয়ে গেছে, আচমকা মরেছে মানুষ, মরেছে পশু। বৃষ্টির ফলে রুক্ষ মাটির বুকে জেগে উঠেছে প্রাণ ধারণের খাদ্য। মানুষের ও পালিত পশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে। গাছপালা, মহীরূহ, বনের পশুপাখী, সবার প্রাণ বেঁচেছে আকাশের অকৃপণ বারিসিঞ্চনে। চোখের সামনে এই সব দেখেছে, আর দেখেছে বৃষ্টিদানে প্রকৃতির দুর্বোধ্য খেয়াল। অমনি আকাশের দিকে মুখ তুলে 'করুণাময় বিধাতা' বলে ডেকেছে মানুষ, তাঁর দয়ার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, তাঁকে তুষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছে।

ওপোক্ ও আমালাগানে যে যার ঘরে চাটাইয়ে শুয়ে আছে। দেখছে রাতের গাঢ় আঁধার কেমন থেকে থেকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সামান্য বিদ্যুতের

প্রকাশে ঘরটা চকিতের জন্য ম্লান আলোয় ভরে ওঠে। আর যখন আকাশের এদিক থেকে ওদিক দ্বিখণ্ডিত করে বজ্র-বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, নিমেষের জন্য ধাঁধা লেগে যায় চোখে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটার তীব্র নিনাদে কানে তালা লেগে যায়, সমগ্র পরিবেশ বিরাট ঝাঁকুনি খায় একটা।

পাতার চাল এবং বাঁশের মাচান সব শুকিয়ে ছিল। তার ভিতর ফুটো হয়ে জল পড়তে থাকে। চাটাইয়ের উপর চটর চটর করে জলের ফোঁটা পড়ে, কাদা হয়ে ওঠে কাঁচা মাটির মেঝে। কিন্তু এ অসুবিধার জন্য কেউ বিব্রত বোধ করে না। ওপোকু ও আমালাগানে ত মোটেই নয়। শুয়ে শুয়ে ওপোকু আকাশ-দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে। মানত করে, সব চেয়ে ভালো ডিম পাড়ে যে সাদা মুরগিটা, সেটাই বলি দেবে। তারপর পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে যে প্রলয় তাণ্ডব চলেছে তাই আজ হয় ওর কাছে ঘুমপাড়ানী গান।

আমালাগানে কিন্তু শুয়ে থাকতে পারে না। তাকে উঠে পড়তে হয়। ঘরের জিনিসগুলি টানাটানি করে সামলায়। মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো চকিত দীপ্তি ও ঝড়ের অনির্বাণ শন্‌শনানিতে ভয় পেয়ে শিশুরা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করে আমালাগানে। একবার ছুটে বেরিয়ে যায়, জলের পাত্রগুলি ছাঁচ-তলায় প্রবল ধারার নিচে ধরে দিতে হবে। ঘরে যখন ফিরে আসে, সারা গা বেয়ে জল পড়ছে। চকিত চমকে কষ্টিপাথরের মত পালিশ করা দেহটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ওঠে।

বৃষ্টি নামার ফলে বেঁচে গেছে বলে কৃতজ্ঞতা বোধ করে না রূপসী। বরং তার মনের মধ্যে বেপরোয়া ভাব ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। রাগে গজ গজ করে ও। অনাবৃষ্টির সমস্ত দায়িত্ব আর একটু হলেই সবখানি ওরই উপর চাপিয়ে দেওয়া হত।

নাস্তিক নয় আমালাগানে। প্রকৃতি উপাসক কোন দিনই নাস্তিক হতে পারে না। কিন্তু ওর বিশ্বাস, দেবতারাও মানুষ এবং পশুর মত। সাহস নিয়ে অগ্রাহ্য করে বুক চিতিয়ে তাদের সামনে যে দাঁড়াতে পারে, শেষ পর্যন্ত তাকে পথ ছেড়ে দেয় ওরা।

বৃষ্টিপাতের ফলে সাময়িক যে স্বস্তির ভাব জেগেছে ওর মনে, তার ফলে পালিয়ে যাবার মতলবটা কার্যকরী করার বাসনাই দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, দরকার হয়, ছেদনের আগেই পালাবে। নিজের মনের জোরের কথা ভেবে গর্ব বোধ করে আমালাগানে। এতটুকু অনুতাপ জাগেনি বলে মন প্রসন্ন হয়; দেবতাদেরও শেষ পর্যন্ত মার্জনা করতে হল তার হৃদয়ের গভীর কামনাকে। স্বর্গে মর্ত্যে যে দুরন্ত মাতামাতি পৃথিবীর বুক প্রাণরসে সঞ্জীবিত করছে, তারই মধ্যে পরম পরিতৃপ্তির প্রশান্তিতে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে রূপসী।

সব সমাজের মত আফ্রিকার বন্য সমাজেও নারীর নৈতিক জীবন চালিত হয়েছে পুরুষের স্বার্থে। নারীও পুরুষের ব্যবস্থাগুলি সানন্দে মেনে নিয়েছে। প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যেও এই মনোভাব বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

"স্ত্রীর বয়ঃসন্ধিকাল পার না হতে তার দিকে ছুটো না।"

"পাঁচ বউ মানে পাঁচটা জিভ।"

"বউ হল কম্বল, গায়ে দিলে কুট কুট, ছুড়ে ফেললে শীত।"

"বউ যদি বোকাও হয়, তা বলে কি কেউ একা শোয় ?"

"বলবি না যা পাঁচ জনাকে, ঘরের কোণে একা বসেও বলিসনে তা মাগকে।"

"বিয়ের জন্য যে মেয়ে খুঁজছে, তার কি উচিত মেয়েদের গাল দেওয়া ?"

"বিয়ের পর বউ যে কদিন টাটকা, সে কদিন দুনিয়ার সবই মিঠে।"

বিয়ের আগে অবাধ মেলামেশার মধ্যে অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে যারা পারে, তাদের সবাই তারিফ করে। যাদের পদস্খলন হয়েছে, তাদের নিন্দার শেষ থাকে না। বিয়ের আগে দৈহিক সংযমে অভ্যস্ত হলে বিয়ের পরে একনিষ্ঠতা সহজে সম্ভব হয়—এই হল মূল কথা। প্রলোভন জয়ের পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রেম ও কাম তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে না। স্বামীর ঘর গৃহস্থালি ও সন্তানপালনে সে সহজেই মন দিতে পারবে।

এই যে পরম বঞ্চনা তার মূল্য কিছু থাক বা না-থাক, সামাজিক কটূক্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পড়শীর কুমড়ো ক্ষেতে নগ্ন দেহে যতই লাফিয়ে বেড়াও না কেন, কেউ কিছু বলবে না, যদি কুমারীত্ব নিয়ে কোন সংশয় না ওঠে।

ঝড়ের রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই খুব ভোরে উঠে পড়ে ওপোকু। তারপর ধনুক ও তূণটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সবাই জানে ওপোকু চলেছে শীকারে। কিন্তু ও চলেছে পাশের এক গ্রামে, যেখানে ছেদনকারী পোকুবুগার বাস। এই পোকুবুগাই আসন্ন অনুষ্ঠানে ছেদন কৃত্য করবে।

কাজ সেরে ওপোকু যখন নিজের গাঁয়ে ঢোকে, সূর্য তখন সবে অস্ত গেছে। ওর কাঁধে ফিরতি-পথে-মারা একটা শূয়োর। গাঁয়ে ঢুকে ও নিজের বাড়ী মুখো হয় না। সোজা চলে আসে আমালাগানেদের বাড়ী।

উঠোনে যখন পা দিয়েছে, তখন মেয়েরা রাতের খাবার পরিবেশন করছিল। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে বর্ষীয়সীকে অভিবাদন করে ওপোকু,

মরা জানোয়ারটাকে ঝুলিয়ে দেয় মরাই-এর একটা খুঁটির গায়ে। তারপর মাটির উপর একটা কোণে বসে পড়ে। এই দস্তুর, অন্তত ভদ্রতা।

একজন মহিলা তাড়াতাড়ি একটা টুল নিয়ে আসে। আর একজন যায় এক খোলা জল আনতে। সবাই ব্যগ্র হয়ে পড়ে, অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।

'আরে ওখানে বসেছিস কেন?' বলে কর্তামা, 'ঠিক সময়েই এসেছিস বাবা, বসে যা এসে হাতে মুখে জল দিয়ে।'

কর্তা আর তার ভাইয়েরাও তাদের মধ্যে ওপোকুর জন্য জায়গা করে দেয়। বউদের কথার জের টেনে 'এসো এসো' বলে সাদর আহ্বান জানায়।

বাড়ীর ভিতর কর্তা-মা-ই অভিভাবক। তাই তাকেই আগে অভিবাদন করতে হবে, তার কথাই চলবে। কর্তার মোড়লিটুকু বাড়ীর বাইরেই সীমাবদ্ধ।

এবাড়ীতে ওপোকু বরাবরই এসেছে। আমালাগানেকে যে ও খুবই ভালবাসে সে খবরও সবাই জানে। সামাজিক সম্পর্কে একই গোষ্ঠীভুক্ত ওরা দুই ভাই বোন। ওদের মধ্যে ভালবাসায় দোষের কোন কিছুই নেই। বরং ভাইয়ের যে বোনের প্রতি এতখানি টান, এতে খুশী বোধ করে সবাই। ছেলেদের এবং মেয়েদের এই ঘনিষ্ঠতাকে সবাই প্রশ্রয় দেয়। কারণ এই মেলামেশায় জীবনের যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ে, পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে তার মূল্য অনেকখানি।

তাছাড়া, সুবিধাও আছে। এই দাদারা সব সময়ই এটা ওটা হাতে করে আনে। কখনও বা মোরগটা, কখনও বা খানিকটা তামাকপাতা। আবার বাড়ীর হয়ে অনেক কাজও তারা হাসিমুখে করে দেয়। ভাই-বোনের এই অন্তরঙ্গতা অনেকখানি প্রশ্রয় পায় সত্য, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার একটা সীমাও নির্দেশ করা থাকে।

এই ভালবাসা যে কখনো আসল প্রেমের মহড়া হয়ে দাঁড়ায় না, তা নয়।

সামাজিক প্রথা এবং নীতিবোধ মনের মধ্যে এমন জোরে চেপে বসে আছে যে, অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি সহজেই তার নিচে চাপা পড়ে যায়।

'ওপোকু ত এ বাড়ীর পথ ভুলে গেছে,' ঠাট্টা করে বলে ওঠে একজন।

কর্তা মন্তব্য করে, 'আসবে কি করে ? জখমটা ত কম হয় নি।'

'কেমন আছিস বাবা, একদম সেরে গেছে ত?' সমস্বরে বলে ওঠে অনেকে। সকলের স্বরেই একটা আন্তরিক আত্মীয়তার ভাব ফুটে ওঠে।

সবাই উৎফুল্ল ওকে পেয়ে। অঢেল খাবার ও পচাই দিয়ে ওকে যত্ন করতে ব্যগ্র।

আজ সবারই মন খুশী। কুঞ্জে পূজা-বলির পরই বৃষ্টিপাত ঘটেছে। তাতে মাটির তৃষ্ণা মিটেছে। পাপের আশঙ্কাও গেছে দূর হয়ে। হালকা মনে তাই সবাই হাসছে, হৈ-হল্লা করছে। কলকণ্ঠে সর্দারের বিজ্ঞতার তারিফ করছে। সর্দার যে ঘরে ঘরে বলিদানের কথা বলেছিল, সে নির্দেশ যে তামিল হয়েছে, উঠোনের বেদীগুলোর গায়ে তার প্রমাণ প্রকট।

মেয়েরা সলজ্জভাবে চোখ নিচু করে ঘোরা-ফেরা করে। আমালাগানেও।

'আজ এখানে থেকে যা বাবা,' বলে কর্তা-মা। 'আমালাগানের পাশের চাটাইতেই শুস তুই। এই ত শেষ। এর পরেই ত ছ্যাদন হয়ে গেলে চলে যাবে পরের ঘরে, নিজের মরদ জুটে যাবে ওর।'

'থাক্ মা,' বাধা দিয়ে বলে আমালাগানে, 'সারা দিন বনে বনে ঘুরে কষ্ট করেছে। নিজের বাড়ী গিয়ে আরাম করে ঘুমোক।'

মুখে বললেও আমালাগানের চোখের দৃষ্টিতে মনের সত্যটুকু প্রকাশ পায়—ওগো, তুমি যেয়ো না, আজ রাতটুকু থেকে যাও।

'বাড়ীই যাব,' বলে ওপোকু, 'তবে একটু বসে গল্প করে যাই।'

মেয়েরা লম্বা লম্বা তামাকের নলগুলো নিয়ে আসে। আমালাগানে

নিজের নলটা ওপোকুর হাতে এগিয়ে দেয়, ও যাতে নিজের হাতে ওকে তামাক সেজে দেয়।

কখন কে কোন্ কাজে সরে পড়েছে। হঠাৎ বুঝতে পারে, ঘরে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

'পোকুবুগার সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছি,' চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলে ওপোকু। 'সে রাজী হয়েছে, তোকে কুমারী বলে ঘোষণা করবে।'

'এই তোর দৌড়!' মন্তব্য করে রূপসী।

'তোর জন্য অনেক কিছু এনে দেব—জ্বালানি কাঠ, মোরগ, ধান, ভুট্টা', জবাব করে ওর প্রিয়তম।

'এই করবি তুই?' শ্লেষভরে প্রশ্ন করে আমালাগানে।

'আর কি-ই বা করবার আছে?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে ওপোকু। সামাজিক রীতিনীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে সে, কিছুটা বেশীই বরং করেছে।

'আমাকে নিয়ে পালাতে পারিস?'

'কোথায়!' আমালাগানের প্রশ্নটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না ওপোকু।

'যেখানে হয়। চাঁদের পূবে, সূয্যির পশ্চিমে, তারাগুলির দক্ষিণে, রামধনুর উত্তরে। নতুন দেশে, নতুন করে ঘর বাঁধতে পারি যেখানে।

'শোন্। একটা নৌকো নেওয়া যায়। নদীনালাগুলি বৃষ্টির পর এখন কানায় কানায় ভরা। স্রোতের টানে ও তোড়ে রাতারাতি অনেক দূর ভেসে যেতে পারব। এদেশ ছাড়িয়ে, ওই পাহাড়ের সারি পেরিয়ে। এমন দেশে যাব, যখানে কেউ যেতে পারে না। মার কাছে ছোট বেলায় শুনেছি, সে দেশের কথা। তুই শিকার করে আন্‌বি, আমি দেব খাবার তৈরী করে।'

'কখন যাবি?' বোকার মত প্রশ্ন করে ওপোকু। ভাব্‌বার সময় নেয় শুধু।

'ছ্যাদনের আগেই।'

'কেন? কোন ভয় নেই তোর। তিন হাজার কড়ি দেব, কথা দিয়ে এসেছি; পোকুবুগা তোকে কুমারী বলে ঘোষণা করবে।'

'কি দরকার? যে দেশে আমরা গিয়ে ঘর বাঁধব, সেখানে কুমড়ো ক্ষেত নাও থাকতে পারে। আর থাকলেও আমি লাফিয়ে বেড়াব না সেখানে।'

'আর দেও-দানা আত্মা?'

'তাদের সব পিছনে ফেলে চলে যাব আমরা। শুধু তোর ও আমার পূর্বপুরুষের বেদী থেকে একটু করে মাটি নিয়ে যাব। যেখানে ঘর বাঁধব, নতুন মন্দির ও বেদী গড়ব সেখানে। তোর-আমার ছেলে পূজো-বলি দেবে তাতে।'

'আর আমার বাপ, সন্ধ্যের সময় ঘরে-ফিরে-আসা গরুর পাল, নদীর জলে আমার মাছ ধরার পলোগুলি, বনের মধ্যে আমার শিকারের ফাঁদ, যে বিরাট মদ্দা হাতিটা বর্ষার সময় এদিকে আসে, যেটাকে শিকার করার এত লোভ আমার, আমার নতুন ক্ষেত, আবাদের জন্য নিকিয়ে পুড়িয়ে যা তৈরী করে রেখেছি, আমার ভাই বোন, আমার ···।'

আমালাগানে স্থির হয়ে শোনে কথাগুলো, গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওপোকুর দিকে। ওপোকুর মন ঘুর ঘুর করে তার সব কিছু সম্পদ ও পারিবারিক বন্ধনের চারপাশে।

হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে ওঠে রূপসী, 'আর আমার পোষা নিরীহ মুরগিগুলো! কতকগুলো ডিম পাড়তে শুরু করেছে, আমার ছাগীটারও বাচ্চা হয়েছে সেদিন। যে রঙিন ঝুড়িটা বুনতে শুরু করেছি, তারও অর্ধেকটা মাত্র শেষ হয়েছে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো রোজ সন্ধেয় গল্প শোনে আমার কাছে, তারা খুঁজে পাবে না আমাকে। আর ওই পুকুর, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে শিখে থেকে যেখানে চান করি আমি।

ওই বড় গাছটা, তার ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে কি খাসা ব্যাঙের ছাতা গজায়। আমার নিজের ছোট ক্ষেতটায় এরই মধ্যে চারা উঠেছে। আমার মা-বাপ ভাই-বোন ··· '

রূপসীর নাক মুখ চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে কপালের শিরাটা। তা কি রাগে, দুঃখে, না ঘৃণায় ?

লজ্জায় কোন কথা বলতে পারে না ওপোকু।

কর্তাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি বক্তব্যটুকু সেরে নেয় ঃ

'শিকার থেকে ফিরে এসে জবাব দেব, ছেদনের আগের দিন।'

কর্তার সঙ্গে একদান কড়ি খেলে ওপোকু উঠে পড়ে। ওরা দুজনে যখন আলাপ করছিল, বাড়ীর সবাই তখন শূয়োরটাকে কাটাকুটি করেছে। ওপোকু দেবী-বসুমতীর জন্য কিছুটা মাংস নেয়, আর বাবার জন্য নেয় একটা সামনের রাং। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পড়ে।

তিন দিন পরে।

'আহা, সতী কুমারী গো, একেবারে নিদ্দুষী,' গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে পোকুবুগা। মরচে ধরা লোহার পাতটা উঁচু করে ধরে, টস্ টস্ করে রক্ত বেয়ে পড়ে সেটার গা দিয়ে। মেয়েটার ছড়ানো দু পায়ের দু পাশে ঠ্যাং ফাঁক করে বসে ছিল পোকুবুগা। আঙুলগুলো মাটিতে মুছে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

পোকুবুগার ঘোষণায় ধন্য ধন্য পড়ে যায়। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে, রূপসীর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। নিথর নিস্পন্দ আমালাগানের মৃতকল্প দেহটা কাঁধে তুলে নেয় একজন, তারপর দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলে যায়। অতিথ-কুটুম যারা ভিড় করেছে, তারা দুপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গান করতে থাকে।

রূপসীর অজ্ঞান দেহটা ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দিতেই এক বুড়ী তাড়াতাড়ি কাটা জায়গায় বেরেলা পাতা আর বিরোর আঁশ লাগিয়ে দেয়।

চিতাবাঘ জাতের সমগ্র পরগনা জুড়ে সে রাতে মহোৎসব চলে। ওপোকু যে শিকার থেকে ফিরে আসে নি, তা নিয়ে কেউ কোন মন্তব্য করে না। কোন মাথা ব্যথা নেই কারো।

শিকারীরা ত জঙ্গলে গিয়ে একা একা এমনি অনেক দিনই কাটিয়ে আসে, তা নিয়ে আবার ভাবনা করে কে!

দ্বাদশ অধ্যায়

আমালাগানের কাছ থেকে ফিরে এসে সে রাতে ভাল ঘুম হল না ওপোকুর। বেরেটুও'র হাল্কা কুরুরু … কুরুরু … কু … কু … কু … ডাকে রাতের অবসান ঘোষণা না হতেই ও চাটাই ছেড়ে উঠে পড়ে। বেড়ার গায়ে গজালে ঝোলানো ধনুকটা টেনে নামিয়ে নেয়। কাঁধের উপর গলিয়ে ঝুলিয়ে দেয় তীরভরা তূণটা। একটা ছোট কুড়োলও সঙ্গে নেয়। আরো নেয় একটা চামড়ার ঝোলা। কয়েকটুকরো সেঁকা হরিণের মাংস, আর গোটা কয়েক আটার সেদ্ধ ডেলা দিয়ে ভর্তি করে সেটা।

শিকারে গিয়ে বেশী দিন জঙ্গলে কাটাবে এমন মতলব ওর নেই; ছেদনের আগেই ফিরে আসতে হবে যে। তবু একদিনের জন্যও যদি আটকে পড়ে, তারই জন্যই এত সব সঙ্গে নেওয়া।

ওপোকু যখন গাঁয়ের ভিতর দিয়ে চলে, ঘরে ঘরে সবাই তখনও ঘুমে অচেতন। কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় শুধু।

ওই দিগন্তে বন পেরিয়ে যে তৃণভূমি, তারই অভিমুখে এই শিকারযাত্রা। সেখানে চরে বেড়ায় বুনো মোষের পাল। বিচিত্র বর্ণ জেব্রা দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালায় হরিণ ও খরগোশ, চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। বছরের কোনো কোনো বিশেষ ঋতুতে আবার ভ্রাম্যমাণ হস্তীযূথও আসে ওখানে, লাল টকটকে কুবে ফল খাওয়ার লোভে।

একা একা হাতি শিকারে যাওয়ার মত আর কোন কাজেই এত গভীর চিন্তা ও ভাব-রোমন্থন মনকে পেয়ে বসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মন। শিকারটার খেই যদি হারিয়ে যায়, পথ যদি যায় গুলিয়ে, তখন হয় ত স্বপ্নে ছেদ পড়ে। আর যখন চরম মুহূর্তের

অপরিসীম উত্তেজনা নিয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় শিকারটাকে মোক্ষম ঘা মারতে, তখন সে স্বপ্নময় পর্দাটা একেবারে সাদা হয়ে যায়। এই আঘাতের অব্যর্থতা শিকারের সহজ সিদ্ধি এনে দেয়। আবার, অনেক সময় জীবন-মরণ সঙ্কটের মুখোমুখি ফেলে দেয় একেবারে।

লক্ষ্যভেদ সার্থক হলে ফিরতি পথের পদক্ষেপ আনন্দে চটুল হয়ে উঠবে। আর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরতে হলে দীর্ঘ পথ ক্লান্তির আবেশে ক্রমেই দীর্ঘতর হবে। এই অবস্থায় কোন এক তুচ্ছ বিষয়ই হয়ত বারে বারে ঘোরা ফেরা করে মনের মধ্যে। ক্লান্ত অবসন্ন মন তাকেই আঁকড়ে ধরে। একটানা অফুরান পথে অবিরাম পদক্ষেপের মত সেই এক চিন্তার খাদেই গুটিগুটি ঘুর ঘুর করে মন।

কদমে এগিয়ে চলে ওপোকু, দৃঢ় বিশ্বাসেই ও পথ ঠিক করে নেয়। অন্ধকারের মধ্যেও পায়ে চলা পথ চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্ধ যেমন হাতের ছোঁয়ায় পথ চিনে চলে, ওপোকুকে তেমনি পথ চিনিয়ে দেয় তার পায়ের তলা। কখন কোন্ মুহূর্তে সে কোন্ খানে রয়েছে, পায়ের তলার অনুভূতি তাকে তা বলে দেয়।

রাতের আঁধার যেটুকু পাতলা হয়েছে, তাতে গাছ পাতা চিনে নেওয়া যায় না। কিন্তু জানোয়ারের মত তীব্র ঘ্রাণ শক্তি দিয়ে গন্ধ শুঁকেই ওপোকু বুঝতে পারে, কোথায় কোন্ পরিচিত লতা, ঝোপ বা মহীরুহ। কানও তাকে পথ চিনে নিতে সহায়তা করে। সিংহ এবং চিতাবাঘও এমনি করেই ঘুরে বেড়ায়, নির্ভুলভাবে লক্ষিত স্থানে সোজা পৌঁছে যায়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের এই তীব্র অনুভূতিপ্রবণতার জোরেই আফ্রিকার শিকারী তার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের খ্যাতি অর্জন করেছে।

সোজা এগিয়ে চলে ওপোকু। পথে কি আছে, তা ভালো দেখা যায় না। তবু পথের যেখানে যা আছে, সহজাত প্রবৃত্তিবলেই যেন তা বুঝতে

পারে। নির্ভুলভাবে সব কিছু এড়িয়ে চলে। মনে আজ ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। এমন হালকা মন অনেক দিন উপভোগ করেনি ও।

ওপোকু ভাবতে থাকে ঃ

নারীর কামনা সত্যিই অদ্ভুত, বিস্ময়কর ; ওর নিজের দুঃসাহসী হৃদয় আজও যা নিয়ে সংশয়ে দুলছে।

আর মেয়েটা কি-না তাতে একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, যা খুশী করবার জন্য তৈরী! যে সব আনুষঙ্গিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, সেই সব কিছু ছাড়তে রাজী আছে মেয়েটা, মনের কামনা চরিতার্থ করবার জন্য। সমাজের যে সব বিধান ওপোকুর কাছে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে যে কামনা, তা সত্যি এক তাজ্জব বস্তু।

পালিয়ে যাওয়া! আশ্চর্য! সব বিপদ থেকে পার পাওয়ার এই পথটি তার মনে একবারও জাগেনি কেন? অবশ্য কৃতকর্মকে সে নিজের দিক থেকে বিচার করেনি। তার ফল কি ভাবে বংশ ও গোষ্ঠীকে বিপন্ন করবে, এই কথাই সে ভেবেছে বার বার। শুধু নিজের কথা ভাবলেই যদি চলত, কত সহজ হয়ে যেত সমস্যা।

অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। আশপাশের জিনিসগুলি কিছু কিছু চিনতে পারছে ওপোকু। যে সব জীব সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকে, তারা ঘুমের জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফুটে উঠে যাদের জানিয়ে দিয়ে যায় নব জাগরণের সংবাদ, তারা নড়ে চড়ে উঠছে।

বানরের দল শুরু করেছে তাদের কিচিরমিচির। টিয়ে পাখীর দল ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। আরও হাজার রকম পাখীর কলকাকলিতে বনস্থলী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেক উঁচুতে গাছের মাথায় মাথায় পাতাগুলি, শন্ শন্ শব্দ করছে।

ঝিঁঝিঁর ঐক্যতান আর কোলা ব্যাঙের মক্ মক্ শব্দ একেবারেই থেমে গেছে। একটা হাইর‍্যাক্স গাছের কোটরে তার বাসায় ফিরতে দেরি করেছে। গাছের বাকল বেয়ে উঠতে শুরু করেই সেটা বীভৎস চীৎকার জুড়ে দেয়। রক্ত জমিয়ে দেওয়া সে ডাক তীব্রতর হতে হতে চরম পর্যায়ে ওঠার মুখেই হঠাৎ থেমে যায়। অনভ্যস্ত কানে শুনলে মনে হয়, যেন কোন শিশুর গলা কাটা হচ্ছে—আর এ তারই আর্তক্রন্দন।

ওপোকুর কাছে এইসব বিভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন রব ধ্বনি মাত্র নয়। বনের বাসিন্দাদের পরস্পর আলাপের গূঢ় তত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে ওপোকু। শুধু ওপোকু নয়, আফ্রিকার বনচর মানুষ বনের প্রাণীদের এই দুর্বোধ্য আওয়াজের প্রতি পরতে পরতে অর্থযুক্ত ভাষা আবিষ্কার করেছে। পশুর চীৎকার, পাখীর গান—সবই তার কাছে সহজবোধ্য সার্থক ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জন করেছে, এই শব্দের ঝঙ্কার তার কানে যে শুধু আনুষঙ্গিক অর্থের ইঙ্গিত দেয় তাই নয়, প্রতিটি ধ্বনি বিশিষ্ট অর্থের দ্যোতনা করে। তাদের কাছে তাই পশুপাখী কীটপতঙ্গ—সবাই মানুষের মত সবাক জীব।

বানর দলের কিচিরমিচির, পাখীর কলকাকলি ও মধুর সঙ্গীত—মানুষ মাত্রকেই পুলকিত করে। কিন্তু অযুত জীবের বাথান বিশাল অরণ্যের সব শব্দ যেখানে আপন বক্তব্যে সার্থক হয়ে ওঠে, সেখানে সেই ভাষায় দীক্ষিত মানুষের অন্তর অবর্ণনীয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবেই।

সেই অপূর্ব অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে এগিয়ে চলে ওপোকু।

"তোর পাছা লাল রে, তোর পাছা লাল" একটা মর্কট আর একটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে একপাল বানর তাকে ধমক দিয়ে ওঠে।

একটা য়্যাপাটুপিয়ার পাখী মধ্যস্থতা করে গেয়ে ওঠেঃ

"ঝগড়া করিসনে রে তোরা ঝগড়া করিসনে।"

"চিরদিন কভু সমান যায় না।" ওপোকুর পায়ের কাছে ঝাপটা মেরে গেয়ে ওঠে একটা নাইটজার পাখী। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে যায় তার চন্দন-ছিটানো ডানা মেলে।

পথের ঠিক উপরে একটা লম্বা লেজওয়ালা পাখী ঘাড় কাৎ করে ওপোকুর দিকে তাকাতে থাকে, তার পর মধুর স্বরে গেয়ে ওঠেঃ

"ডুডু ডুডু ডুডু
ডুডু
ডুড়ু ডুড়ু ডুড়ু;
পরানপতি ছেড়ে গেল
ডুড়ু;
আর যদি না দেখা পাই
ডুডু;
কোন্ সুখেতে খাবার খাই
ডুডু।"

"চাচা, চাচাচা, চা—" বিরহিণীর বিলাপকে শ্লেষভরে ভেংচি কেটে ওঠে একটা ধনেশ পাখী।

"আচমকা মরে যাব, আচমকা মরে যাব", বিড় বিড় করতে করতে একটা মুনিয়া বিদ্যুৎ গতিতে উড়ে চলে যায়।

একটা লাল ঠ্যাংওয়ালা তিতির পথের উপর দিয়ে ছুটে যায়। উড়বার প্রচেষ্টায় মাথা নীচু করে লেজ তুলে ছোটে। লম্বা দৌড়ের শেষে যখন শিশিরে ভারি ডানা দুটো সামলে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ে, কোন্

হরিণীর নামে অভিযোগ ঘোষণা করে সে ঃ

'ওবুরায়ের হরিণী, হরিণী হো,
ওবুরায়ের হরিণী, হরিণী হো,
ওবুরায়ের হরিণী, হরিণী হো—

হঠাৎ গেয়ে ওঠে একটা আতেওয়া পাখী ঃ

ডোয়ে
ডোয়ে
পেট থেকে পড়ে হাঁটতে যদি চায়—
ভালো নয়, সে তো ভালো নয়।'

তারপর ওপোকুর দিকে চোখ পড়তেই সুর ধরে দেয় ঃ

ওডিয়াবুয়ো ও ম্মেরেকিসি রে
হাতির দাঁত তুই দিস্ আল্‌গা করে।
তুই সেরা শিকারী, ওরে শিকারী-সর্দার,
এগিয়ে যা,
সাদা-নেকো বাঁদরীটাকে খুঁজে-কর বার,
ভালো ঝোল বানাবি
মজা করে খাবি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ওপোড়ু পাখী যোগ দেয় ঃ

'দেখ্ দেখ্, বাচ্চাটা তাকিয়ে রয়েছে
তীর ধনুক আমার দিকে বাগিয়ে ধরেছে,
কলাপোড়ার সঙ্গে
আমায়, চিবিয়ে খাবে রঙ্গে!'

হুম্!
"হুম্!—"

একটা পেঁচা সায় দেয় কি প্রতিবাদ করে বোঝা যায় না।
চির-অসুখী আবুরোবুয়ো জুড়ে দেয় তার স্বভাবসিদ্ধ বিলাপ :

'মরার কালে মা আমায়
দিয়ে গেল ভাঙা ডালের কোলে।
ভাঙা শাখা মরল ;
তালপাতার পাঁজরে
আমায় তুলে দিল।
মরল মরল তালের পাঁজর।
নুয়ে পড়া চারার কোলে
আমায় দিল ছুঁড়ে ফেলে।
নুয়ে পড়া চারাটা
বড় জ্বালা দিল যে হায়
বলি কারে ব্যথাটা।

বুনো আফ্রিকার নাকাড়ার ভাষার মত আফ্রিকার অরণ্য-জগতের ভাষার রহস্যও তার ধ্বনি-তরঙ্গের উচ্চনীচ বৈচিত্র্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে। অদীক্ষিতের কাছে তা একেবারেই অর্থহীন ও দুর্বোধ্য।

ওপোকু এবার চলে উৎরাইয়ের পথে। সামনে নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। কি গভীর! কি তীব্র তার গতি! জল ঘোলাটে হলদে। এ পর্যন্ত যতটুকু বৃষ্টি হয়েছে, তাতে এমনটি ত হবার কথা নয়! ওপোকু এতে বিস্মিত হয় না। ও জানে উত্তর দেশের বর্ষণেও বন্যা নামে, এখানে বৃষ্টি যাই হোক না।

জলের ধারে এগিয়ে আসে ওপোকু। সঙ্গে সঙ্গে একটা মাদী হিপো পাটল রঙের মাথাটা উচিয়ে পিচকিরির মত জলের সূক্ষ্মধারা শূন্যে ছিটিয়ে দেয়। তারপর একটা উদ্ধত নাসা-গর্জন করে ঘোলাটে ঘূর্ণিস্রোতের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁড়ে বানানো একটা নৌকো। তার উপর অনেক কষ্টে উঠে বসে ওপোকু। তারপর পা দিয়ে জল কেটে ওপারে গিয়ে হাজির হয়। লতায় পাকানো একটা রশি দিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দেয় নৌকাটা।

সামান্য পথ পার হতেই বনের চেহারা বদলে যায়। শুধু বড় বড় ঘাস আর ঘাস, দিগন্ত পর্যন্ত ঘাসের রাজত্ব। এখানে ওখানে দু-একটা গাছ রাখালী করছে যেন। বর্ষার দিনে জলে জলময় হয়ে যায় এ অঞ্চল, নৌকো ছাড়া এক পাও চলা যায় না। এত বড় ও এত ঘন ঘাস কাটিয়ে নৌকো বাওয়া সম্ভব হয় না। হাতির পাল এসে ঘাস মাড়িয়ে যেটুকু ফাঁক সৃষ্টি করে দিয়ে যায়, শুধু সেই পথেই নৌকো চলে।

এখনও এই তৃণপ্রান্তর শুষ্ক। এখানে সেখানে ঘাস ও শরের ডাঁটি-গুলো আধপোড়া হয়ে পড়ে আছে। গত বছর এখানে যে দাবানল জ্বলেছিল, তারই দাহে শজারুর কাঁটার মত সাদা কালোয় মেশানো হয়ে ডাঁটিগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

বর্ষা নামেনি বটে, কিন্তু পথ চলা এখনও সহজ নয়। পশুর পায়ে পায়ে ঠাস বুনানো ঘাসের মধ্যে যেখানে একটু ফাঁক হয়েছে, তাছাড়া অন্য পথ নেই আর। যেখানে হাতিতে পথ করেছে সেখানে চরম বন্ধুরতা। অসতর্ক অবস্থায় কখন যে এক কোমর গর্তে পড়ে যেতে হবে তার ঠিক নেই। প্লাবনের শেষে নরম মাটিতে বিরাট পা ফেলে অজস্র খাদ সৃষ্টি করে রেখেছে হাতির দল।

'এই জল তোকে গিলে ফেলবে রে হাতি', খাদগুলি লাফিয়ে চলতে চলতে বিড় বিড় করে ওপোকু।

প্রান্তরের মাঝখান চিরে গত বর্ষায় যে পথ হয়েছিল, তাই ধরে ওপোকু এগিয়ে চলে। খুব সজাগ হয়ে চলতে হয়। এ-পথে ও-পথে

অবিরত কাটাকাটিতে পথ ভুল হয়ে যাওয়া এতটুকুও বিচিত্র নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের প্রতিটি বাঁক লক্ষ্য করে দেখে নেয়, কিন্তু একবারও থামে না ওপোক্।

ইতিহাসের লিখিত কাহিনীর মত কত কথাই না বলে ওকে পথগুলো! তাম্রশাসন বা শিলালিপির উপর যেমন নতুন লেখার তলে পুরোনো লেখা চাপা থাকে, এ পথেও তেমনি এক পরত পশুপদচিহ্নের নীচে চাপা পড়ে আছে, পরতে পরতে কত পায়ের দাগ।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় ওপোক্। পুরানো পথের উপর একটা শুক্নো ঘাসের আঁটি, বেশ কয়েক মাস আগে তা পায়ের চাপে পিষ্ট হয়েছে। কিন্তু আজই ভোরে যে সদ্য শিশির ঝরে পড়েছে তা থেকে, ওপোকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে যায়। দু হাত দিয়ে মাটির উপরকার দলিত ঘাসগুলি সরিয়ে ফেলে নিচেকার মাটি পরীক্ষা করে। তে-কোনা দাগটা দেখেই ও বুঝতে পারে, একটা ভুয়কার গিয়েছে এ পথে। মনে মনে হাসে ওপোক্, প্রবাদটা মনে পড়ে যায়ঃ 'হাতি তাড়িয়ে এসে ছাতার ধরতে পথ ছেড়ে যায় না কেউ।'

আরো কিছু দূর এগিয়ে যেতেই ওপোকুর দৃষ্টি পড়ে একটা গাছের উপর। দেড় মানুষ উঁচুতে রুক্ষ বাকলের গায়ে খানিকটা কাদা শুকিয়ে রয়েছে। একটা হাতি ওখানে গা ঘষেছিল নিশ্চয়ই। ক মাস আগে হয়ে থাকবে তা, তাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না ওপোকুর।

একটা বাঁক ঘুরতেই একটা মোষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আর কি। দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বুনো পশুটা যেন বেশী বিব্রত বোধ করে, পাশ ফিরে ঘাসের জঙ্গলে সরে যায়। ঘুরঘুর করতে থাকে সেখানে।

জোর কদমে এগিয়ে চলে ওপোক্। তবু কিছুই কিন্তু তার নজর এড়ায় না।

ঐ কি দেখা যায়!

সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে ওপোকু। হাতির পায়ে দলা একটা পথে ঘাসগুলো সদ্য ভাঙা হয়েছে। হাতি শিকারে যে বেরিয়েছে, তার কাছে এ যে পরম আশার প্রথম ইঙ্গিত। পাশে আর একটা জানোয়ার-চলা পথে দু পাশের দুটো দীর্ঘ শর ডাঁটি থেকে একটা মাকড়সার জাল ঝুলছে। ছিন্নভিন্ন জালটার গায়ে অজস্র শিশিরবিন্দু চিক্‌চিক্ করছে রোদে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ওপোকু। ঘাসগুলি দু হাতে সরিয়ে মাটিতে হাত লাগিয়ে পরীক্ষা করে তার তাপ। বসে সময় নষ্ট করে না, সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে, আবার শুরু করে পথ চলতে। কোন ব্যতিক্রম নেই পথে, আর সব পথের মতই, একই ভাবে চলেছে। এটুকু বুঝতে পারে ওপোকু, যে একটা হাতি রাতে ওই মাকড়সার জাল পার হয়ে চলে গেছে, শেষ রাত্রির শিশির পাতের আগেই।

ওই পথ ধরেই ওপোকু এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। অবশেষে দেখে একরাশ সদ্যনিঃসৃত হস্তীমল। শিশুও বুঝতে পারে এর স্বরূপ। ঠাণ্ডা চটচটে মলের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি ঢুকিয়ে দেয় ওপোকু, বেশ আরাম বোধ করে।

ওপোকু বুঝতে পারে যে একটা দলছাড়া মদ্দা হাতি একা দ্রুত পদে চলে গিয়েছে এ পথ দিয়ে। চিহ্ন ধরে ও সোজা এগিয়ে চলে, ডাইনে বাঁয়ে এতটুকু বাঁক ফিরতে হয় না। একবার লক্ষ্য করে, একটা উঁই ঢিবির কিনারা কেটে ছিঁড়ে গেছে, দোদুল-দোলা শুঁড়ের ছোঁয়ায় নিশ্চয়। আরও কিছুটা দূরে ওপোকু দেখতে পায় ঘাসবিহীন একটুকরো মাটির উপর বিরাট একটা পায়ের ছাপ। সনখর পদতলের ছাঁচটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ইউরোপীয় শিকারী হাতির যে পরিমাপ করে—কাঁধের উচ্চতা পায়ের তলার বৃত্তের তিন গুণ—ওপোকু তার হিসেব রাখে না। কিন্তু এটুকু বুঝতে ওর

দেরি হয় না যে জানোয়ারটা সত্যি অতিকায়। দলিত ঘাসের চিহ্ন ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে যায় ওপোকুকে।

'এই হাতিটাকে মারতে পারি ত রূপসীকে নিয়ে পালিয়ে যাব,' নিজের মনে বার বার আওড়াতে থাকে ওপোকু। ক্রমে তার পদক্ষেপও ওই সঙ্গে তাল দিতে শুরু করে। হবেই বা না কেন! লক্ষণ সবই শুভ। হাতিটাকে মারতে পারলে নিশ্চয়ই তাতে সৌভাগ্য প্রকট হবে, আর তারই ফলে মনে জাগবে আরও দুঃসাহস।

আরো এগিয়ে। এক মুহূর্তের জন্যও যেন হাতিটা থামে নি কোথাও, অবিরাম চলেছে। পথের দুপাশে মাঝে মাঝে যে রসাল অ্যাকাসিয়া পাতা ঝুলছে, মুখ ঘসে গেছে তার গায়, তবু এক গ্রাস কামড়ে নিতেও থামেনি জানোয়ারটা। চলতি পথে হাতিটা যে কিছু খেয়েছে, তার একটি মাত্র চিহ্ন পেল ওপোকু। হাতের কড়ে আঙুলের মত সরু একটা কাঠি কুড়িয়ে পেল। চিবানোর দাঁত দিয়ে ডালটার গা থেকে বাকলটা একেবারে চেঁছে নিয়েছে গজরাজ। এমন সূক্ষ্ম কৌশলে কাজ সেরেছে যে কাঠের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি। মুখের লালায় ডাঁটিটা এখনো ভিজে। বুনো হাতি রীতিমত ভোজনবিলাসী। গাছের উপরকার কোন পত্রগুচ্ছ যদি মনে ধরে, একটি একটি করে হাত দিয়ে তা চয়ন করে মুখে পুরবে — এমন দৃশ্য দুর্লভ নয় আফ্রিকায়। অবশ্য হাত মানেই শুঁড়, আফ্রিকার লোকে হাতই বলে তাকে। করীরাজের করপল্লব কেবল ভারতেরই ভাষাপ্রয়োগ নয়।

সূর্য এতক্ষণে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। অন্য সময় হলে ওপোকু এতে চিন্তিত হত না। দু-এক রাত জঙ্গলে একা কাটানো ওপোকুর কাছে মোটেই কষ্টকর নয়। কিন্তু ও যে কথা দিয়ে এসেছে, ছেদনের আগে ফিরবে!

লক্ষিত জানোয়ারটার গতি শ্লথ হয়েছে, এমন কোন লক্ষণ প্রাণপণে কামনা করছে ওপোকু। কেন চোখে পড়ছে না দলিত ঘাসের একটা বৃত্ত, যা

থেকে বোঝা যাবে, কুকুর যেমন বসবার আগে চরকির মত ঘুরপাক খায়, তেমনি ঘুরপাক খেয়েছে হাতিটা।

সারাদিন তীব্র উত্তাপ ঢেলেছে সূর্য। হাতিটা নিশ্চয়ই তৃষ্ণা নিবারণ করতে ও গা ডুবিয়ে ঠাণ্ডা হতে কোনো জলভরা খাদ খোঁজ করবে। তাই করলে তবেই ত শিকারী তার নাগাল পাবে, অন্তত দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারবে কিছুটা।

শেষ পর্যন্ত তৃণ-ভূমিও শেষ হয়ে যায়। ঘাসে ভরা প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার ওপোকু উঠে আসে ছোট ছোট গাছে ছাওয়া নীচু একটা পাহাড়ে। এখানকার শান্ত শীতল ছায়ায় নিশ্চয় হাতিটা বিশ্রাম করছে।

আচমকা ঝিঁ ঝিঁর ঐক্যতানে আঁধারের আগমনী ঘোষিত হয়। সব যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল, পরিচালকের নির্দেশদণ্ড হেলনমাত্র ঝঙ্কার বেজে উঠেছে। ঝুঁটিওয়ালা বিশালকায় টুরাকু পাখীগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অস্তাচলগামী সূর্যের বন্দনা জুড়ে দেয়। সূর্য এখানে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে দিগন্তে বিলীন হয় না। স্পষ্ট অনুভব করা যায় কেমন ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল নীচে, দৃষ্টির বাইরে। তাই গোধূলি-আঁধারের বালাই নেই। দিন থেকে রাতে হঠাৎ পটপরিবর্তন। বনের বুকে রাত যেন আরও চকিতে নেমে আসে।

পায়ের চিহ্ন অনুসরণের আর ভরসা পায় না ওপোকু। রাতের আস্তানা ঠিক করতে লেগে যায়। একটা ঘাসের আচ্ছাদন খাড়া করে তালপাতার শয্যা রচনা করতে মোটেই সময় লাগে না ওর। তৃষ্ণার কথা মনে পড়তেই চার পাশে তাকিয়ে ও একটা লিয়ানা ফল দেখতে পায়। হাতের কবজির মত মোটা সেটাকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা দিক কেটে ফেলে। তারপর মুখে পুরে দিয়ে স্নিগ্ধ শীতল জল পান করে পরম তৃপ্তিতে।

কুঁড়েটার পাশে বসে বসে আগুন জ্বালে ওপোকু। থলি থেকে কিছু খাবার বার করে খেয়ে নেয়। তারপর তামাকের নলটা নিয়ে ধূমপান শুরু করে। হাতিটাকে মেরে রূপসীকে নিয়ে পালাবে—এই আশা মনে জাগতেই আবার ভয় হয়, ছেদনের আগেই ফিরতে হবে যে। 'দূর ছাই'—সব ভাবনাকে ধমক মেরে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও শুয়ে পড়ে।

ঝর ঝর বৃষ্টির ফোঁটায় ওপোকুর ঘুম ভেঙে যায়। রাত শেষ হতে তখনও বাকী। আবার আগুন জ্বালে, তারপর গুটিসুটি মেরে বসে কাটিয়ে দেয় বাকী রাতটুকু। কোন ভাবনাকে মনে ঠাঁই দেয় না।

ভোরের কুয়াসা কেটে পথ চিনে নেবার মত আলো ফুটতেই রওনা হয়ে পড়ে ওপোকু। কাল বিকেলের মত স্পষ্ট পথ নয় আজ। উই-তোলা মাটিতে হস্তীমলের তুঙ্গ চাপা পড়ে গেছে। মাথার উপর পাতার চাঁদোয়ায় ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ছে।

ওপোকু চলেছে ত চলেছেই। কখনও ঘন ঝোপ ভেদ করে, কখনো মুক্ত প্রান্তর বেয়ে, কখনো কুয়াসাচ্ছন্ন গাছের গুঁড়ির পাশ কাটিয়ে।

আর একটা নদী। কাল যে বড় নদীটা পার হয়েছিল—এটা তারই শাখা; দুর্বার স্রোতে ছুটে চলেছে।

কাঁধ থেকে তূণটা খুলে নেয় ওপোকু। তারপর তূণ ধনুক কুড়োল এবং থলিটা একসঙ্গে করে নেয়। মালের বোঝাটা এক হাতে উঁচু করে ধরে সাঁতরে নদী পার হয়ে আসে।

এপারে ঘনবনময় ছোট্ট একটা দ্বীপ। সেখানে আসতেই ওপোকু এইবার দেখতে পায় সেই অভীষ্ট দলিত বৃত্ত, আফ্রিকার হস্তীর ক্রীড়াঙ্গন।

চারিদিকে ধ্বংস-তাণ্ডবের অবর্ণনীয় নিদর্শন। এমন বিপর্যয়ের দৃশ্য, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

বড় বড় গাছ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে, গুঁড়িগুলো মাঝখান দিয়ে ফাটা। কতকগুলি গাছ আমূল শিকড়সমেত কাত হয়ে লম্বা পড়ে আছে। মাটির উপর যেন অজস্র হুরমশ চালিয়েছে কেউ। এখানে অর্ধচর্বিত গাছের ছিবড়ে, ওখানে মন্দিরের মত মলের ঢিপির উপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কোথাও বা মূত্রের ডোবায় ফেনা তখনও মরে নি।

আনন্দে হৃদয় নৃত্য করতে থাকে ওপোকুর। হাতিটা তা হলে এখানেই সারা রাত কাটিয়েছে। কয়েক গজ পিছনে হস্তীপদচিহ্নকে কুড়ি ঘণ্টা আগের মনে হয়েছে; এখানে বোধ হয় তার বয়স বিশ মিনিটও নয়। একটা গাছের ডালে উঠে বসে ওপোকু এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখতে থাকে।

দূরের গহনতম অরণ্য থেকে গাছ ভাঙার মড় মড় শব্দ ক্ষীণ হয়ে কানে এসে বাজে। শোনা যায়, গাছ পড়ার ধুপধাপ আওয়াজ।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ওপোকু। এক মুঠো শুকনো মাটি তুলে নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দেয়। দেখে, ধুলোগুলি ধীরে ধীরে সোজা ভেসে চলেছে, যে দিক থেকে শব্দ আসছে, সেই দিকে। বাতাসে ধুলো উড়ে যায়, কিন্তু এত ক্ষীণ বাতাস, যে তার ছোঁয়া গায়ে লাগে না। প্রাণ খুলে বেশ কিছুটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বসে পড়ে ওপোকু। কাঁধ থেকে তূণটা নামিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়, থলিটাকেও রাখে সেখানে। তারপর একটা তীর বেছে নিয়ে ধনুকে গুণ টেনে দেয়। সব শেষে সে কুড়োলটা পরীক্ষা করে দেখে। সরু লম্বা ফলাটার উপর দিয়ে একবার আঙুল বুলিয়ে নেয়, হাতলটাকেও টেনে দেখে একবার।

ওপোকুর মাথায় এঁটে বসানো ছিল একটা তরমুজের খোলার টুপি। সেটা খুলে নিয়ে মাটিতে রাখে। তারপর কিছুটা মাংস, কয়েকটা আটার

ঢেলা ও কিছু তামাক পাতা তার মধ্যে রেখে নিবেদন করে। শিকারীদের এ জাতীয় টুপিতে অনেক দেবতার বাস কি-না।

এবার ধনুক বাণ ও কুড়োলটা হাতে নিয়ে চলতে শুরু করে ওপোকু। আর সব কিছু পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। বৃত্তাকার পায়ের দাগ ধরে ঘুরতে শুরু করে দেয়। সন্ধান করতে থাকে, ঠিক কোন্ খানে হাতির পায়ের চিহ্ন বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেছে। অপরিসীম সাবধানতায় অগ্রসর হয় ওপোকু। শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে পা ফেলে না, পাছে কোন শুকনো ডাল পায়ের চাপে মট করে ওঠে, কিংবা খস খস করে ওঠে শুক্‌নো পাতাগুলো। ঝোপঝাড় পার হয়ে চলতেও কত লতা সরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এত সাবধানে সেগুলো সরায় ও, যাতে ছেড়ে দিতেই তা ছিটকে শব্দ করে না ওঠে। আরও লক্ষ্য রাখে, কি জানি কখন নাড়া লাগতেই হুড়মুড় করে উপর থেকে পচা ডালপাতার প্রপাত মাথার উপর ধসে পড়ে।

পায়ের দাগগুলি একবার এদিকে বেঁকেছে, তারপরই আবার বেঁকেছে ওদিকে। কখনও বা পুরোনো পথেই ফিরে এসেছে। এক একবার মনে হয়, সব হারিয়ে গেছে, মিথ্যা পণ্ডশ্রম। কতকগুলি বাঁদর ওর্ গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে তারা, 'তোকে দেখতে পেয়েছে রে, তোকে দেখতে পেয়েছে।' —বলেই লতায় ডালে দোল খেতে খেতে সরে যায় দূরে, গাছ পাতায় দারুণ আলোড়ন তুলে।

ওপোকু দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে থাকে। হাতিটা ওর আগমনবার্তা টের পেয়েছে, এমন নির্দেশসূচক কোন আওয়াজ প্রত্যাশা করে। বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দ ছাড়া আর কিছুই কিন্তু শুনতে পায় না। এবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে গুটি গুটি এগোয়।

হঠাৎ উৎকট গড় গড় ও ভোঁস ভোঁস শব্দ শোনা যায়। অনভিজ্ঞের কানে এ শব্দ নিশ্চয়ই বিভীষিকা সৃষ্টি করত। কিন্তু অভিজ্ঞ ওপোকু জানে

যে বিরাট উদরে বায়ুর শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয় এ। শব্দটা আসে মাত্র কদম পনের দূরের ঘন ঝোপের ভিতর থেকে।

ধনুকবাণ ভুঁইয়ে রেখে শক্ত মুঠিতে কুড়ালটা ধরে হামা দিয়ে এগিয়ে যায় ওপোকু। মাত্র চার কদম দূরে হাতির পায়ের থলথলে চামড়াটা চোখে পড়ে, এক জোড়া ঢোলা পাৎলুন যেন। লেজটা ত একেবারে ওপোকুর মাথার উপরে দোল খাচ্ছে। ও তা স্পর্শও করতে পারে।

কুড়োলটা দোলাতে থাকে ওপোকু। একটা ছুটো চকিত আঘাত হানার পর হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং-এর মত পিছনে লাফিয়ে পড়ে ওপোকু। কিন্তু বিড়ালের মত পায়ে ভর করে ঠিক দাঁড়িয়ে যায়। তারপরই আর এক লাফে লুকিয়ে পড়ে একটা ঝোপের ভিতর, প্রাণের দায়ে দেহটা দুমড়ে মুচরে বসে থাকে।

এদিকে যে শুরু হয়ে গেছে মহাপ্রলয়। অরণ্য জগতের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে যায় দুর্দম পদক্ষেপের বিকট শব্দে। শত দুন্দুভি শিঙা নাকাড়া যেন এক সঙ্গে বাজিয়ে ক্রোধে চীৎকার করে ওঠে গজরাজ। সেই চীৎকারের মধ্যে যেটুকু বিরাম পাওয়া যায়, তা গাছ ভাঙার মড় মড় শব্দ। ডাল ভাঙছে, গুঁড়ি ওপড়াচ্ছে, গাছের ধাক্কায় গাছ পড়ছে একসঙ্গে যেন পাঁচ-দশটা। মাটি ফাটিয়ে আওয়াজ উঠছে দুড় দাড়, দ্রুম্ দ্রাম্, মড়্ মড়্। সমগ্র মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে ভূমিকম্পের মত।

তারপর হঠাৎ সব শান্ত হয়ে যায়। শুধু বৃষ্টির ঝর ঝর-এর সঙ্গে কোন ক্লান্ত মানুষের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় যেন।

রাগে দিশেহারা হাতিটা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বাতাসে ঘ্রাণের সন্ধান করতে থাকে—কে তাকে আঘাত করেছে। একবার যদি গন্ধ পায়, খুঁজে বার করবেই তাকে। তারপর তার বুক পেট চিরে, হাত-পা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, পায়ের চাপে মাটিতে মিশিয়ে দেবে তাকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হাতিটা, ধীরে ধীরে শুঁড়টা শূন্যে দোলায় আর নানা ভঙ্গিতে বাঁকায়। যে দিকে ওপোকু পালিয়েছে, সে দিক থেকে এক ঝলক বাতাস আসতেই, হাতিটা গন্ধ পায় ওপোকুর। যে মুহূর্তে হাতিটা দাঁড়িয়ে গেছে, ওপোকু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানো বন্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাতিটার এই শান্তভাবের গূঢ়ার্থ ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ওপোকু। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওর জীবন-মৃত্যুর সমাধান হয়ে যাবে।

একটা বিকট চীৎকার করে আক্রমণ করে গজেন্দ্র। পরমুহূর্তেই মড়্ মড়্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওপোকু যেখানে শুয়ে পড়েছিল, সেখানকার মাটি কেঁপে ওঠে। ওপোকু দেখতে পায়, সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ে গেল হাতিটা।

এবার ওপোকুর পাগল হবার পালা। ভূতে পাওয়ার মত করতে থাকে। চীৎকার করে ওঠে, তারপর যেন যুদ্ধ রব শুরু দেয়। দিব্যি গালছে, নাচছে, লাফ মেরে শূন্যে উঠছে, আহবান করছে দুশমনকে—'আয়, উঠে এসে খুন কর্ আমায়।'

প্রাণে যে বেঁচে গেছে, একথা স্পষ্ট বুঝতে পারে ওপোকু। বুনো হাতির পায়ের পিছন দিকের স্নায়ু শিরা এবং পেশী জখম করার যে দুঃসাহসিক এবং কঠিন কৌশল, তাতে কৃতকার্য হয়েছে। এবার বাছাধন অচল ও অসহায়! তিন পায়ে ভর করে যেখানে আছে সেখান থেকে আর নড়বার উপায় নেই। এখন সুবিধা মত ধীরে সুস্থে খতম করা যাবে।

কিন্তু আগে চাই ধনুকবাণ উদ্ধার করে আনা। ঝোপ ঝঙ্গল ভেদ করে দৌড় মারে ওপোকু। যতই শব্দ হোক্ না এখন, কি যায় আসে তাতে! ধনুকবাণ যেখানে আছে, স্থাণু হাতিটার শুঁড় পৌছবে না সেখানে।

এই প্রথম করীরাজ তার আততায়ীর দর্শন পায়। বিরাট কান দুটো পত্ পত্ করতে থাকে, ঝড়ের তোড়ে উড়ে যাবার মুখে তাঁবুর যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় হাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ ফোঁসফোঁসানি চলতে থাকে। তারপর সমস্ত শরীরটা দোলায়। একবার এ পা তোলে, তারপর ও পা, যেন নাচ শুরু করে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, সামনে এগোবার সাহসই নেই। শুধু নিদারুণ গর্জন করে, আর ক্রোধ-রক্ত ক্ষুদে চোখ দুটো দিয়ে তাকায়।

ওপোকু দূরত্বটা ভাল করে অনুমান করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ধনুকবাণ উদ্ধার করে আনে। আরো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ে ওপোকু। হাতিটাকে দেখতে থাকে। তার নিষ্ফল ক্রোধ ও অচল অবস্থা দেখে মজা পায়। ওই বিশাল ক্রোধ-শৈল, তার এই অসহায় অবস্থা! কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকে। ওপোকুর মনে হয়, তার নিজের যেন কোন জাদুকরী শক্তি আছে, যার জোরে সে হাতিটাকে এক জায়গায় আটকে দিয়েছে।

নিশ্চিত মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওপোকু। দাঁড়িয়ে উঠে ধনুকে তীর যোজনা করে। অপেক্ষা করতে থাকে সুযোগমত ক্ষণটি। তারপর তড়াক করে ছেড়ে দেয় বাণ, আর সেটা ঠিক হাতিটার শুঁড়ের ডগায় গিয়ে বেঁধে। তীরের ডাঁটিটা সঙ্গে সঙ্গেই খসে পড়ে শুঁড়ের ঝাপটে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বিষাক্ত ফলাটা মাংসের মধ্যে গেঁথে থাকে। হাতিটা আর একবার আক্রমণের চেষ্টা করে। একবার উলটে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, দাঁত দুটো দিয়ে কোন মতে পতন ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুখটা সম্পূর্ণ হাঁ করে আর্তনাদ জুড়ে দেয় হাতিটা, আর ওপোকুকে ধরবার জন্য প্রাণপণে শুঁড়টা বাড়াতে থাকে। তার অপরিসীম ক্রোধ আর ভীষণ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায় ওপোকু। কয়েক পা পিছিয়ে এসে গুণতে থাকে—এক দুই তিন চার পাঁচ; পাঁচ এক, পাঁচ দুই, পাঁচ তিন,

পাঁচ চার, পাঁচ পাঁচ। একটা করে পাতা ছিঁড়ে নেয়, আবার গুণতে শুরু করে।

ছ' নম্বর পাতা ছেঁড়া হতে না হতেই, হাঁটুতে ভর করে হাতিটা বসে পড়েছে। বিরাট দাঁত দুটোর ডগা মাটিতে সেঁধিয়ে গেছে। পর্বত প্রমাণ দেহটা থর থর করে কাঁপছে লতার মত। এক একটা ঝাঁকানি দেয়। দেখে ভয় লাগে ওপোকুর, এখনি বুঝি বা আবার দাঁড়িয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে হাতিটা ঝিমিয়ে আসে, শুঁড়টা অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, যেন কালো মাম্বা একটা। সব ক্রোধ ও উত্তেজনা এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। শুধু ছোট ছোট দুটো চোখেই যা জীবনের চিহ্ন। এক দৃষ্টে সে দুটোতে তাকিয়ে থাকে ওপোকুর দিকে।

ওপোকুর গোনা শেষ হয়ে গেছে। আট দশ আর পাঁচ পর্যন্ত গুনেছে ও।

করীরাজও ততক্ষণে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরে ওপোকু এগিয়ে যায়। তারপর অনেক কষ্টে শুঁড় বেয়ে সেই মাংসের বিরাট ঢিপিটার উপর উঠে দাঁড়ায়। তখনও উষ্ণতা কাটে নি সে মাংসপিণ্ডে।

এবার পাশ বেয়ে নেমে আসে ওপোকু। কুড়োলটার সন্ধান করতে হবে ত। পেয়েও যায়। অক্ষতই রয়ে গেছে সেটা। কুড়োলটা দিয়ে কুপিয়ে ওপোকু হাতির লেজটা কেটে ফেলে। অতবড় বিরাট দেহে কি ক্ষুদে ল্যাজটা! হাসি পাওয়ারই কথা। তবু ওই ল্যাজটাই ওর কাছে দামী। দাঁত দুটোর কোন মূল্য নেই ওর কাছে। হাতির দাঁতের খোঁজে যারা দল বেঁধে জঙ্গল চড়াও হয়ে শক্তিশালী বন্দুক দিয়ে পালে পালে হাতি খুন করে, তাদের খবরই জানে না ওপোকু। মাংসই ওর কাছে বড় কথা। এত বড় লাশটা থেকে কত ঝুড়ি মাংসই না পাওয়া যাবে!

আর, কত বড় বীর বলে প্রতিভাত হবে ও! হাতিটার শ্রাদ্ধের সময়, জীবনে অন্তত একটি দিনের জন্য, ওপোকু সকল বর্ষীয়ানের চেয়েও বেশী সম্মান

পারে। সর্দার-ভূস্বামীর পর্যন্ত ঈর্ষার পাত্র হবে। হ্যাঁ, হাতিরও শ্রাদ্ধ করে আফ্রিকানরা। শিকারী নিজেই করবে। নইলে, মৃত পশুর আত্মা তৃপ্ত না হলে, অনেক জ্বালাতন করতে পারে সেটা। গাইয়েরা আর বাজনদারেরা সেদিন সারা রাত ধরে ওপোকুরই তারিফ করবে। সে গৌরব রজনীর কথা ভাবতেও গর্বে বুক ফুলে ফুলে ওঠে।

শুঁড়ের ডগা থেকে তীরের ফলাটা কেটে বার করতে লেগে যায় ওপোকু। তার আগে শুঁড় থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে মাটিতে রাখে, দেবী-বসুমতীর অর্ঘ্য হিসাবে।

আরো জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। একটা ছাউনি তৈরী করে রাতের মত এখানেই থেকে যেতে হবে তা হলে। আগে গিয়ে তবে সেই তরমুজের খোলার টুপিটা নিয়ে আসতে হয়, আর থলিটা। হাতিটা সর্বশেষ যেখানে আস্তানা গেড়েছিল, সেখানেই সব ফেলে এসেছে ওপোকু।

কিন্তু সেদিকে পা ফেরাতেই এ কি হল ওপোকুর! হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমালাগানের কথা। তাকে যে কথা দিয়ে এসেছে, সে রাতেই বাড়ী ফিরবে। সব ভুলে মেরে দিয়েছে দীর্ঘায়িত শিকারের উত্তেজনায়! মায় ছেদনের ব্যাপারটা পর্যন্ত!

তাড়াতাড়ি তীর ধনুক তুলে নিয়ে ওপোকু দ্রুত পায়ে চলে আসে যেখানে থলে ও টুপি রাখা আছে। তার পর চটপট সেগুলি কুড়িয়ে নিয়েই রওনা হয়ে পড়ে। যে পথ ধরে সকালে এসেছে, সেই পথেই ফিরে চলে।

সকালে-পার-হওয়া নদীটা এখন দ্বিগুণ আকার ধারণ করেছে। কাল রাতে যে আগুন জেলেছিল তারই ভস্মাবশেষের পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওপোকু। কোথাও ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, কোথাও বা সংকীর্ণ বনপথ। দ্রুতপদে ওপোকু সব পার হয়ে চলতে থাকে।

এবার ওপোকু বুঝতে পারে, মাটি ক্রমশ ঢালু হয়ে এসেছে। সামনে বিরাট সমতল প্রান্তর। অথচ রাত আসতে আর দেরি নাই। ওপোকু হাঁটছে না, ছুটছে। বনের মধ্যে যতক্ষণ ছিল, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এবার বৃষ্টিধারা গা বেয়ে ছুটেছে, জল ঢুকছে চোখে মুখে কানে। পায়ের তলের নরম মাটিতে পিছলে পড়ে বার বার আছাড় খায় ওপোকু

এবার আর ঘাসগুলি সামনের দিকে নুয়ে পড়েনি। প্রতিটি তৃণশীর্ষ তীক্ষ্ণ বর্শার মত ওরই দিকে উদ্যত, পলোর মধ্যে আটকে-পড়া মাছগুলোর যেমন মনে হয়, কাঠিগুলো তাদেরই দিকে মুখ করে আছে, ঠিক তেমনি। এই ঘাসগুলির 'বর্শা-ঘাস' নাম তাই মিথ্যে নয়।

কোথাও হাঁটুজল, কখনও বা আধ হাঁটু। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে। জমাট মেঘের বুকে চ্যাটালো বিদ্যুৎ খেলে সে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে দেয়। বিশ্বাস করতে পারে না ওপোকু, এত জল আসছে কোথা থেকে।

কাঁধ থেকে থলিটা নামিয়ে রাখে, নামিয়ে রাখে হাতিয়ারগুলো। একটা গাছে উঠে পড়ে ; লম্বা লম্বা ঘাসের উপকার বিস্তৃত দৃশ্য যাতে চাক্ষুষ করতে পারে। ভাল করে দেখবার ভরসায় বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে।

হঠাৎ বড় একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়, দূর দিগন্ত পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একি ? যত দূর চোখ যায়, চারদিকে সাদা ঝক্ ঝক্ করছে! কী এ? নদী? তা কখনই সম্ভব নয়। আরও একবার বিদ্যুৎ চমকায়, আগের চেয়েও জোরালো। এবার ক্ষণিক আলোয় যা চোখে পড়ে, তা শুধু জল আর জল। তার উপর এখানে সেখানে গোছা গোছা ঘাস মাথা তুলে রয়েছে। এখানে সেখানে খাড়া হয়ে আছে দু-একটা গাছ।

সমগ্র সমতল অঞ্চল প্লাবনে ডুবে আছে। দুকূল ছাপিয়ে একাকার হয়ে গেছে নদী। কারো সাধ্য নেই, কোন উপায় নেই, জল না কমতে এই আ-দিগন্ত জলরাশি পার হয়ে যাবে।

কিন্তু সে যে কথা দিয়েছে, ঠিক সময়ে আমালাগানের কাছে পৌছবে! দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যায় ওপোকু। না না, যেতে তাকে হবেই। গাছ থেকে নেমে মরিয়া হয়ে জল ভেঙেই ও চলতে শুরু করে।

জল এবার কোমর পর্যন্ত উঠেছে। বারে বারে আছাড় খায় ওপোকু। প্রতিবারেই অক্টোপাসের মত দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করে তৃণদল জড়িয়ে ধরে তাকে। চেপে ডুবিয়ে মারতে চায়।

আর পারে না। কোন উপায় নেই। হতাশ হয়ে টলতে টলতে পিছন দিকে ফিরে আসে ওপোকু। নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে যখন উঁচু মাটিতে পা ঠেকে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে ওপোকু দেহটা এলিয়ে দেয়।

পর দিন আরও একবার চেষ্টা করে। কিন্তু দিনের আলোতেও এতটুকু সুরাহা হয় না। আবার ফিরে আসতে হয়।

সেই রাতেই ঘাসের উপর শুয়ে ওপোকু শুনতে পায়, আদিগন্ত জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে-আসা নাকাড়ার ক্ষীণ আওয়াজ কি যেন বলছে।

বলছে: আমালাগানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

হ্যাঁ, সময় মত এসে এই পরীক্ষা থেকে রক্ষা করবে রূপসীকে—এই অঙ্গীকার করে এসেছিল ওপোকু। এই সর্বপ্রথম ওপোকু অনুভব করে, আমালাগানেকে সে ভালোবাসে।

অনেক পূর্ণিমা অমাবস্যা কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠিক সূর্যাস্তের পর চিতাবাঘ গোষ্ঠীর গাঁয়ে একটা লোককে দেখা যায়। তার সারা গায়ে ঘাসে কাটার দাগ। ছন্নছাড়া হতভাগা মূর্তি। জ্বরে ভুগে ভুগে দুবলা হয়ে পড়েছে। এক হাতের মুঠোয় একটা হাতির ল্যাজ্। সেটাকে উঁচু

করে ধরে সে চেঁচাতে থাকে বার বার ঃ 'আমার বউ কোথায়, কোথায় আমার বউ ?'

বলতে বলতে পড়ে যায় লোকটা। সবাই ছুটে যায়। দেখে, লোকটা আর কেউ নয়, শিকারী ওপোকু।

ধরাধরি করে ওকে বাড়ীতে নিয়ে যায় সবাই। খবরটা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ে। বেজে ওঠে নাকাড়া। তার শব্দতরঙ্গ ঘোষণা করে, দূর দূরান্তরে বার্তা পাঠিয়ে দেয় ঃ মরে গেছে বলে যে শিকারীর আশা অনেক দিন আগেই সকলে ছেড়ে দিয়েছিল, ভূতের রাজ্য থেকে সে লোকটা ফিরে এসেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমালাগানের কানে যখন নাকাড়ার ধ্বনি বেজে উঠল, তাতে তেমন করে মন দেয়নি রূপসী।

পিতৃগ্রামের অনতিদূরের এক বসতিতে সজারুবংশে তার নতুন গৃহস্থালি। সেখানে স্বামীর জন্য খাবার তৈরী করছিল রূপসী। নাকাড়ার ডিম্ ডিম্ দ্রুম্ দ্রুম দূরাগত ক্ষীণ ধ্বনি তার কানে এসে বাজে।

খবরের কাগজওয়ালা বিশেষ সংখ্যা নিয়ে 'টেলিগ্রাম' 'টেলিগ্রাম' বলে হেঁকে গেলে তার যা প্রতিক্রিয়া, আফ্রিকায় হঠাৎ নাকাড়া বেজে ওঠাও তেমনি।

এমনি হঠাৎ খবরের সম্বন্ধে কিছুটা অলস ঔৎসুক্য নিয়েই বর্ষার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দু পা এগিয়ে আসে রূপসী। একটু মন দিয়ে খবরটা ধরবার চেষ্টা করতেই আগ্রহ বেড়ে যায়। নাকাড়ার ধ্বনি বাতাসে ভেসে একবার এদিকে আসে, পর মুহূর্তেই হয়ত বা অন্য দিকে ভেসে যায়।

ধ্বনি-তরঙ্গায়িত সেই সব বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ থেকে আমালাগানে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেষ্টা করে।

'হাতি মেরেছে'—নাকাড়ার যে ধ্বনিতরঙ্গের অর্থ সর্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে রূপসী, এই তার বক্তব্য। পূর্বতন প্রেমিকের সঙ্গে এই খবরের সংযোগ সাধন করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়না ওর।

'হায় ওপোকু! আমার চেয়ে হাতিই তার প্রিয় চিরদিন। হয় ত তা ভালই হয়েছে,' রূপসীর মনের মধ্যে ভাবনাটা ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়।

কুটীরের দেয়ালে হেলান দিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে শুনতে থাকে। মুখে সুরটা ভাঁজবার চেষ্টা করে, মন ছুটে যায় অতীতের কোন্ স্বপ্নলোকে।

'শিকারী ওপোকু, শিকারী ওপোকু'—নাকাড়ার বোলগুলি মুখে আওড়ায় রূপসী। মনে মনে ভাবে, নাকাড়াই হয় ত তার মনোভাবের প্রতিধ্বনি করেছে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে আমালাগানের চিত্ত। তবে কি হাতির পায়ে দলিত ওপোকুর দেহেরই সন্ধান মিলেছে! সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা জাগে মনে : কি যায় আসে তাতে, ছেলের মধ্যেই ত নতুন করে সে বাঁচবে।

এ কি সান্ত্বনা! অথচ এই ওপোকুকে স্বামী রূপে না পেলে একদিন মরবার বাসনা হয়েছিল তার। নিশ্চয়ই ডাইনীতে পেয়েছিল তাকে। হ্যাঁ, চারদিকে ঘুরে-বেড়ানো ডাইনীর সংখ্যা ত কম নয়, পুরুষের সংখ্যারই সমান। আর সবাই ত একই ছাঁচে ঢালা।

আবার দূর থেকে নাকাড়ার স্পন্দন ভেসে আসে, 'ফিরে এসেছে, এসেছে।'

রূপসীর হাতের কাঠের চামচেটা ধপ্ করে পড়ে যায় মাটিতে। আশে-পাশের কুঁড়ে খালি করে দলে দলে কান খাড়া করে সবাই বেরিয়ে আসে। এ গাঁয়ের নাকাড়া-বাজিয়েরাও ছুটে যায়, তাদের নাকাড়াগুলি টেনে বার করতে।

প্রশ্নোত্তরে সমস্ত খবরটা জেনে নিতে দেরি হয় না :

ওপোকু ফিরে এসেছে। জলা অঞ্চলের বিরাট হাতিটাকে সে শিকার করেছে, বংশ পরম্পরায় শিকারীদের কাছে রূপকথায় পরিণত হয়েছিল সে হাতি। জলা অঞ্চলে আটকে পড়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল ওপোকু।

কিন্তু বিস্ময় চরমে পৌছয়, যখন আমালাগানে শুনতে পায়, নাকাড়াগুলি তারই নামে বোল তুলেছে, 'রূপসি, এখনি ফিরে আয়; দেরি করিস না রূপসি, বাড়ী চলে আয়।'

সবাই ওর দিকে তাকায়। বৃদ্ধ স্বামী থপ্‌ থপ্‌ করে ছুটে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'তোর ভাই তোকে ডাকছে, মরছে হয় ত সে।'

হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে যায় বুড়োর, বলে, 'কি জ্বালা, আমার খাওয়ার কি হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে যায়। বড় ভয় করে বুড়ো তাকে। অমনি বলে ওঠে:

'যা যা এখনি চলে যা। কিন্তু ঝুড়ি নিয়ে যাস একটা। সে নাকি হাতি মেরেছে। এক টুকড়ো শুঁড় নিয়ে আসিস। বইতে যদি পারিস, একটা পা-ই বরং আনিস। এই নে ঝুড়ি। যা যা, জলদি যা।'

আমালাগানে কি করবে স্থির করতে না পেরে পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে অধৈর্য হয়ে পড়ে বুড়ো সজারু। খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে, তপস্বী সারসের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে। মাছে এসে পায়ে ঠোকর মারলে তবে হুঁস হবে বুঝি!'

চালের ফাঁক দিয়ে ঘরের ধোঁয়া বেরিয়ে চালের ওপরেই তা জমে আছে। এমন শান্ত নির্বাত নিষ্কম্প সন্ধ্যা।

তারই মধ্যে আমালাগানে যাত্রা করে। বনের যে সাফ অঞ্চল-টুকুতে সজারু কুলের গ্রাম, সেখান দিয়ে পা চালিয়ে চলে রূপসী। সঙ্গে চলে একটি ছোট মেয়ে। আফ্রিকার সমাজে সম্ভ্রান্ত বিবাহিতা মহিলা কোথাও যেতে হলে এ জাতীয় রক্ষিণী একটি অপরিহার্য।

'সাদা মাথার পর' এই সর্বপ্রথম আমলাগানে নিজের গাঁয়ে এল। যে দিন এক বর্ষীয়সী ওর কাছ থেকে এক লাফে সরে গিয়ে, হাত বাড়ীয়ে ওর গায়ে এক মুঠো সাদা ছাই ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমালাগানে এক পেট চুরি করেছিস,' সেদিন থেকে সবাই জানে ওর অবস্থা। তারপর যখন ওর পুরোনো বন্ধু ও খেলার সাথী সবাই এসে ওকে অভিনন্দন করলে, এত

তাড়াতাড়ি 'ডাঁটা চুষে কাজ হাসিল করার' জন্য, তখন সত্যি ওর মনে অপরিসীম গর্ব জেগেছিল। মন ভরে উঠেছিল তৃপ্তি ও আনন্দে। এক প্রশান্ত আত্মপ্রত্যয় আচ্ছন্ন করেছিল ওকে। অতীতের সেই মাদকতাময় পাগলামির কোন স্থান ছিল না এর মধ্যে।

নাকাড়াওয়ালা নাকাড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশ্রাম করছিল। রূপসীকে দেখেই সে দু পা পিছিয়ে গেল। নেচে উঠল, সমগ্র মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করে। তারপর নাকাড়ায় ঘোষণা তুললে, 'এসেছে, আমালাগানে এসেছে।'

খবরটা ঘোষণা করে চলে, আর তার মাঝে মাঝে সর্বজনবিদিত নাকাড়া-গতের প্রবাদগুলি ভরে দেয়। ওর বিবেচনায় যেগুলি সময়োচিত মনে হয়, সেই প্রবচনগুলিই বাজায় নাকাড়া-ওয়ালা। মুখের কথাকে অনবদ্য শব্দ- তরঙ্গে ধ্বনিত করে গুম্ গুম্ করতে থাকে নাকাড়া, 'এসেছে, আমালা-গানে এসেছে, রূপসী বাড়ী এসেছে।'

'বেটী যদি না বিয়োয়, বেটাই ত বিয়োবে,' উদ্দাম শব্দ তুলে কলরোল করে ওঠে নাকাড়া।

'পয়লা পিরিতের রস কি মজেছে?' কোমল স্বরে প্রশ্ন জাগে।

বায়ু-তরঙ্গ কাঁপিয়ে খবরটা রূপসীর স্বামীর গাঁয়েও পৌছে যায়। তার স্ত্রী ঠিক যে মুহূর্তে নিজ গাঁয়ে এসে পৌঁছলো, সঙ্গে সঙ্গে তার খবরও পেয়ে গেল সজারু বুড়ো।

নানা দেহভঙ্গী করে বাজাতে বাজাতে ঘেমে ওঠে নাকাড়াদার। আমালা-গানে মৃদু হাসিতে তাকে অভিবাদন করে। কারো মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করার সময়ই বারে বারে তার নাম ঘোষণা করে নাকাড়া। কিন্তু যে ভাবে দিকে দিকে আমালাগানের নাম আজ ঘোষিত হয়েছে, এমন প্রচার মৃত্যুর পরে ছাড়া

সাধারণত কারো ভাগ্যে জোটে না। এই অভাবনীয় সম্মান সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে রূপসী।

নাকাড়ার ঘোষণায় আমালাগানের স্বগ্রামে ফিরে আসার খবর, তার বিবাহ ও অন্তসত্ত্বা হবার খবর—সব খবরই তার পূর্বতন প্রেমিকের গোচরীভূত হয়ে যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

এতক্ষণ যে বিবরণ দিয়েছি, বিশেষ করে, ওদের দুজনের যে সব গোপন অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি, তার অধিকাংশই জানা গিয়েছে ওপোকুর রোগ-জনিত বিকারোক্তি থেকে। এই কাহিনী যারা আমাকে বলেছে, জলা অঞ্চল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার পর ওপোকুর সঙ্গে আমালাগানের প্রথম যে সাক্ষাৎ, তার বিশদ বিবরণ স্পষ্ট করে কিছুই তারা আমাকে বলতে পারে নি।

সেই ক্ষণটিতে ওদের দুজনের মধ্যে ঠিক যে কি ঘটেছিল, সে খবর কেউ জানে বলেই মনে হয় না আমার। পরবর্তী ঘটনা থেকে যেটুকু সম্ভব অনুমান করে নেওয়া চলে।

ওপোকু সেরে উঠেছে অনেক দিন। বড় শিকারী হিসেবে তার খ্যাতিও বেড়েছে।

আমালাগানের একটি ছেলে হয়েছে। ক্রমে সে ছেলে মাতৃস্তন্যনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠে। চলি-চলি পা-পা করে হেঁটেও বেড়ায়।

এই ছেলেই আমালাগানের প্রাণ। এরই জন্য সে প্রাণ ধারণ করে আছে। সন্তান-স্নেহই আচ্ছন্ন করে আছে ওর সমগ্র সত্তাকে।

সেরে উঠে ওপোকু আমালাগানের কাছে প্রস্তাব করেছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। তবে আমালাগানে রাজী হয় নি।

সত্যি, ওদের দুজনের চরিত্র আগেও ছিল বিপরীত, আজও ঠিক বিপরীতই আছে। কিন্তু একেবারে উলটে গেছে সব। আজ ওপোকুই উদ্দাম প্রেম নিয়ে সব বিপদ অগ্রাহ্য করে রূপসীকে পাবার জন্য ব্যগ্র, কিছুটা মরিয়াও

হয়ত। অগ্রপশ্চাৎ ফলাফল ওজন করে, বিচার করে, পিছ্-পা হবার পালা আজ আমালাগানের। সন্তানের আবির্ভাবই রূপসীর এই মানসিক পরিবর্তনের হেতু। আর দেহের উপর যে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তার ফলেও হয়ত মনোবৃত্তি অনেকখানি বদলে গেছে।

পুরুষের চরিত্র সত্যি অদ্ভুত! যা পেতে বাধা, যা ধরা দেয় না, তারই জন্য তার আকুল আগ্রহ, তারই পিছন পিছন সে ছুটে মরে। আর অঞ্জলি ভরে যে অর্ঘ্য তার কাছে নিবেদিত, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার আকুল আগ্রহ নিয়ে যে নৈবেদ্য সাজিয়ে বসে আছে, তার দিকে ফিরেও তাকায় না। পুরুষ চরিত্রের এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় ওপোকুর স্বভাবে এমন আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এদিকে যাই হোক না কেন, কোন কেলেঙ্কারির ফিসফিসানিও শোনা যায় নি ওদের দুজনকে নিয়ে। মৃত্যুর দিন পর্যন্তও ওদের দুজনকে জড়িয়ে একটা ইঙ্গিতও উচ্চারণ করেনি কেউ।

আমালাগানের সন্তানের প্রকৃত জনক কে, তাতে কিছুই যায় আসে না। আফ্রিকার আদিম সমাজে স্ত্রীর গর্ভজাত স্বাস্থ্যবান পুত্রসন্তান কার ঔরসজাত, কোন স্বামীই তা নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না। বুড়ো স্বামীর ত কথাই নেই।

পাঠকদের কাছে হয়ত এই কাহিনীর যবনিকা এখানেই ফেলে দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা বরং খুশীই হবেন। যাক, সমাজের কঠোর সাজা এবং লোকাপবাদের কলঙ্ক থেকে বেঁচে গেছে আমাদের নায়ক-নায়িকা। তাদের দুঃখ কষ্ট, তাদের আশাভঙ্গ ও ব্যর্থ জীবনকেই আমার পাঠক সমাজবিধান ভঙ্গ করার চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য করবেন।

কিন্তু আফ্রিকার সমাজের যে-কেউ শুনলে বলবে, এই অসমাপ্ত কাহিনী একেবারেই নিরর্থক। আমালাগানে ও ওপোকু যে মহাপাপ করেছে! লঙ্ঘন করেছে রক্ত-সম্পর্কের বিধিনিষেধ, মা-বসুমতীর খোলা গায়ের উপর মিলিত হয়েছে। সমাজে কেউ তা না-ই বা জানল, পোকুবুগা ঘোষণা করলেই বা রূপসীকে অক্ষত কুমারী বলে! সন্দেহের নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত অনুভব করা যায় নি, তাতেই বা কি এলোগেলো! পাপের শাস্তি যে অনিবার্য। মানুষকে ও সমাজকে ফাঁকি দেওয়া সহজ। কিন্তু কোন কিছুই দেবতাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আফ্রিকান পাঠক স্বতই প্রশ্ন করবে : কই, সেই অনিবার্য দৈব-শাস্তির কথা ত বললে না? এ কাহিনীর পরিশিষ্ট তাই শুধু পরিশিষ্ট রচনার প্রয়োজনেই নয়।

এরপর যে বেদনাময় ঘটনা ঘটেছে চিতাবাঘ গোষ্ঠীতে, তা সর্বজনমান্য পুরাণ-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। কত বিশদ বিস্তারে মণ্ডিত হয়েছে সে কাহিনী। পৌরাণিক কাহিনীর মর্যাদা পেতে হলে এ মণ্ডন অনিবার্য। নইলে ভবিষ্যৎ মানুষকে পাপ-পুণ্য-সচেতন করা যাবে কেমন করে!

মানবীয়তা পেরিয়ে এই কাহিনী অপ্রাকৃতত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; ধর্মকথায়ও রূপান্তরিত হয়েছে বোধ হয়। দেবতারা তাঁদের বিধান লঙ্ঘনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে যে বিচার করেন, তার কথা পুণ্য কথা নয়ত কি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেদিনও তেমনি সূর্য উঠেছিল। ওদের প্রতিদিনকার সহজ জীবনের কোন ব্যতিক্রম প্রকাশ পায় নি। দেও-দানব, ভূত-প্রেত, পিশাচ-আত্মা—কেউ কোন আশঙ্কার ইঙ্গিত দেয়নি কাউকে। শুধু উষার অরুণোদয়ের আগেই একটা জ্বলন্ত মহীরূহ ওপোকুর চোখে পড়েছিল — এই যা। হয় ত সেটাই একটা দুর্লক্ষণ, কে বলবে?

এই কাহিনীর শুরু থেকে চার বার ঋতুচক্র আবর্তিত হয়ে আবার শুকনোর দিন এসে গেছে। আমালাগানে তখন ছেলে নিয়ে চিতা-গোষ্ঠীর বসতিতে বাস করছে। এক বিয়ের উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছে ও।

সেদিনও ভোরের আলো ফুটবার আগেই ঘুম থেকে ওঠে রূপসী। এই তার বরাবরের অভ্যাস। উঠে ঘরদোর ঝাঁট দেয়, তারপর নিত্য-কার মত মুরগিগুলিকে ছেড়ে দেয় খোঁয়াড় থেকে।

ছেলেটা তখনও ঘুমে। ঘরের মধ্যে ঢুকে রূপসী একবার প্রাণভরে ঘুমন্ত সন্তানটিকে দেখে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। তারপর বাইরে এসেই মাটির বড় কলসীটা তুলে নিয়ে নদীর দিকে রওনা হয়ে যায়।

নিশ্চয়ই নদীতে কলস ভরে নিয়েছিল রূপসী। কারণ, ভাঙা কলসীটা যেখানে আবিষ্কৃত হয়, সেখানকার বালি তখনও ভিজে। আর জল যাতে চলকে না পড়ে, তার জন্য কলসীর ভিতরে যে পাতাগুলি দেওয়া ছিল, সেগুলিও পাওয়া যায় কলসীর ভাঙা টুকরোগুলির মধ্যে। আরও দেখা যায়, রূপসীর পায়ের ছোট ছোট ছাপ। সে ছাপ সোজা নদীজলের দিকে গিয়েছে। সোজা নদীর জলের দিকে গিয়েছে ছাপগুলি, আবার ফিরেও এসেছে সেখান থেকে। এই পদচিহ্নের সারি কেটে গেছে আর একটা আঁকাবাঁকা অবিচ্ছিন্ন দাগ। যে

কাল মাম্বাটা রূপসীকে দংশন করেছে, তারই চিকণ পথ এই মসৃণ দাগটা।

এই চিহ্নগুলি ত ছিলই। আরও ছিল ছোট্ট দুটো ফুটো, আমালাগা-নের ডান পায়ে।

এই থেকেই সব কথা সবার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বোঝা যায়নি, মাম্বার কামড় খেয়ে বাড়ীর দিকে ছোটেনি কেন রূপসী। তার বদলে সোজা ছুটে গেছে ঝোপে ছাওয়া সেই জলাশয়ে, যেখানে চিতাবাঘেরা এসে জল পান করে।

আরও একটা কথা ধরা যায়নি। রূপসীর প্রাণহীন দেহটা যখন আবিষ্কার করা গেল, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, এই ভাবে পড়ে আছে দেহটা। কেন সে নববধূর মত পাতা পরেছিল—কে বলবে সে কথা? যা-কিছু বেশভূষা মাতৃত্বের লক্ষণ, তা কোথাও দেখা যায়নি তার দেহে। দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কি সব?

নাকাড়াগুলিও নীরব হয়ে থাকেনি। যে নাকাড়া-বাজিয়ে একদিন আনন্দে নেচে হেসে আমালাগানের ঘরে ফেরার খবর ঘোষণা করেছিল, আজ তাকেই বার হতে হল শোকার্ত হৃদয় নিয়ে, আমালাগানের শেষ-যাত্রার সংবাদ যথারীতি ঘোষণা করতে।

ওপোকুও সেদিন সকালে বনের মধ্যে তার পাতার বিছানা ছেড়ে উঠে এল, অন্য যে-কোন দিনেরই মতন। বেশ কয়েকদিন বনে বনে শিকার সন্ধান করে আজই ও ঘরের দিকে রওনা হবে। এবার কিন্তু একটা ছোট হরিণ ছাড়া আর কিছুই মারতে পারেনি।

ওপোকু পথ চলছে। তার কুড়োলের বাঁট থেকে দুটো ছোট ছোট কাছিম ঝুলছে। আরো নিয়ে চলেছে গোটাকয়েক বুনো মৌচাক, পাতায় মোড়ক করে। এগুলি সবই সে 'বোনের' ছেলের জন্য উপহার সংগ্রহ করেছে।

ওর সঙ্গে ছেলেটার চেহারার আশ্চর্য মিল কিন্তু! এমন কি, গালের উপর একটা ছোট সাদা দাগও যেন ওপোকুর গালে সিংহীর আঁচড়ের দাগেরই প্রতিচ্ছবি।

তখনও বনের মধ্যে আলো ফুটে ওঠেনি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ওপোকু। এক অদ্ভুত দৃশ্যের সামনা-সামনি পড়ে গেছে ও। অদূরে গাছের সারি। নিরক্ষ অঞ্চলের বর্ষাবহুল অরণ্যের এই গাছগুলির গুঁড়ি একেবারে রূপোর মত সাদা। তারই মাঝে একটা গাছ থেকে অদ্ভুত এক অবাস্তব দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। আকাশ দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেই অদৃশ্য আকাশ স্পর্শ করেছে বোধ হয় গাছটা। আর তার সারা গা জ্বলছে, যেন লক্ষ লক্ষ জোনাকি নেচে বেড়াচ্ছে আঁধারে।

গাছের গুঁড়িটা একবার ফুলে উঠছে, আবার যেন সরু হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে যেন। গাছের বাকলটা কখনো লাল, কখনো সাদা। চোখ-ধাঁধানো অগ্নিদীপ্তি দপ্ দপ্ করছে। কিন্তু সে আগুনে শিখা নেই এতটুকু, একরত্তি ধোঁয়াও বার হচ্ছে না। তিনশো ফুট উঁচু একটা জ্বলন্ত থামের মত সোজা খাড়া হয়ে আছে। মাথায় তার জ্যোতির ছটা।

অনেক অনেক বার বনে এসেছে ওপোকু। অনেক দিন বনে বনে ঘুরে কেটেছে তার, অনেক অদ্ভুত কিছুর সম্মুখীন হয়েছে সে। কিন্তু এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা; এমনটি কখনও দেখেনি সে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে ওপোকু। এ ত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যা-কিছু অপ্রাকৃত, তাই যে ওদের কাছে বিভীষিকা।

প্রথম বিস্ময় কাটতেই ভয়ও ঝেড়ে ফেলে ওপোকু। তারপর সেই অগ্নি-স্তম্ভের আরও কাছে এগিয়ে আসে। আগুনের হলকা বার হচ্ছে গাছটা থেকে, শুধু নেই কোন জ্বলন্ত শিখা। জ্বলছে কি? কিন্তু পুড়ছে না ঠিকই।

হঠাৎ কানে নাকাড়ার বোল বেজে ওঠে। কি স্পষ্ট সে শব্দ, কি জোর সে আওয়াজ! ততক্ষণে গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওপোকু। নাকাড়ার বক্তব্যটা ঠিক মত শুনবার জন্য গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ে।

প্রাথমিক বোলেই ঘোষিত হয় — কার যেন মৃত্যু হয়েছে।

'হায়! হায়! হায়!' বিলাপ করে ওঠে নাকাড়া। তারপর একটু থেমে বলে:

'আত্মার দেশে গিয়ে—কেউ ফিরে আসে না?'

আবার একটু বিরতি।

'ভূতে যদি ধরে তোকে হাত বাড়িয়ে, হাত নিস সরিয়ে।'

অনেক দূরে আর একটা নাকাড়া শোনা যায়, দূরান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে সংবাদ:

'হায়! হায়! হায়!' কাছের নাকাড়ার বাজানো প্রথম বিলাপেরই বিলম্বিত প্রতিধ্বনি।

আবার বোল ওঠে। কিন্তু এবার তীব্র ধ্বনি নয়। নাকাড়া-বাজিয়েরা স্বর কোমল করে আনার চেষ্টা করে।

'বেটাকে দেখবে ওর—কোন্ সে পরী?'

'ব্যাপারটা কি?' ওপোকুর মনের ভিতর তোলাপাড়া করতে থাকে।

'যখন বাড়ী ছেড়ে যাই, কারো ত অসুখ বিসুখ ছিল না গাঁয়ে!' পরম উৎকণ্ঠা নিয়ে মৃতের নাম ঘোষিত হওয়ার প্রত্যাশায় বসে থাকে ওপোকু। সব শেষে নাম বলা হবে কি-না!

চুপ করে বসে ওপোকু কাছিম দুটোর পিঠে অলস ভাবে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। একবার এটার গায়ে নখ বুলিয়ে চলে, তারপর অপরটার গায়ে। যদি খুট করে ছোট মাথাটা বাড়িয়ে দেয়, সেই উৎসাহে। মাঝে মাঝে বিরাট দীপ্ত মহীরুহটার দিকে ফিরে তাকায়, কখন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে সেটা মাটিতে।

'হায়! আমালাগানে! হায়! হায়! হায়!'

ওপোকু তখনও কাছিম ছুটোর গায়ে আঙুল বুলোচ্ছিল। কি যে করছে সে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠেই দৌড় মারে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মরিয়া হয়ে ছুটে চলে। গাছের ডাল ঝোপঝাড়—সব বাধা ভেদ করে দৌড়য়।

গ্রামের ভিতর থেকে যে পথ পায়ে পায়ে চলে গেছে ঝোপে-ঘেরা জলাশয়ের ধারে, এমনিতে সে পথ প্রায় অদৃশ্য, অজ্ঞাত। কিন্তু আজ তা বড় সড়কে পরিণত হয়েছে। ঘাস ঝোপ ও আগাছা পায়ে পায়ে দলে অজস্র লোক সেখানে পথ বেঁধে দিয়েছে যেন। আমালাগানের দেহ তখনও ঘুমন্তর মত সটান পড়ে আছে, আর তারই চারপাশে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়বিমুগ্ধ জনতা। সর্দার-ভূস্বামীর অনুমতি মিললে তবে লাশটা বাড়ী নিয়ে যাওয়া চলবে। তারই প্রতীক্ষা করছে রূপসীর পরিজন।

এই জনতার বৃত্ত ভেদ করে ছুটে আসে 'পাগলা শিকারী' ওপোকু, নৃত্যোৎসবের রাতে ঠিক যেমনটি এসেছিল। এবারও খ্যাপা মোষের ডাকের মতই যুদ্ধ রব তুলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে, যার জন্য ধেয়ে এসেছে তাকেই সন্ধান করে।

নিস্পন্দ ঘুমন্ত রূপসীকে চোখে পড়তেই ও সামনে ছুটে যায়। পাঁজা কোলে করে তুলে নেয় দেহটা। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি ছুটে বেরিয়ে যায়, জনতার বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে। ধাক্কা খেয়ে লোকগুলো ঝোপের গায়ে ছিটকে পড়ে।

সোজা বনের দিকে ছুটে চলে ওপোকু। একবারও থামে না। চলে আসে সেই জ্বলন্ত গাছটার গোড়ায়। ধনুক-বান, মরা হরিণটা, কাছিম ছুটো আর বুনো মৌচাক—সব ওখানেই ফেলে গিয়েছিল ও। হামা দিয়ে ঝোপের

ভিতর এগিয়ে চলে ওপোকু, রূপসীর দেহটা ধীরে সযত্নে টেনে নিয়ে যায়।

মেয়ে-মরদ-শিশু দলে দলে অনুসরণ করে। অপহরণকারীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গাছের ডাল ভেঙে এগিয়ে চলে। সেই মড় মড় শব্দের মধ্যেও শোনা যায় জনতার কলগুঞ্জন।

সহসা একটা আর্তনাদ ওঠে। অগ্নিকুণ্ডটা চোখে পড়তেই থেমে দাঁড়ায় সবাই। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

ওপোকুর বন্ধুরা ওকে রক্ষা করতে চায়। কেউ কেউ সামনের দিকে এগিয়েও চলে। কিন্তু ওপোকু চীৎকার করে ওঠে, যে কেউ এগোবে, খুন করে ফেলবে তাকে। শুধু মুখের কথা নয়, একটা তীর ছোঁড়ে পর্যন্ত। দলের সর্দারের ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ে তীরটা। যারা ওকে রক্ষা করতে এগোচ্ছিল, তারা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

ঝোপের ভিতর আরও দূরে রূপসীকে টেনে নিয়ে যায় ওপোকু। তারপর নিপুণ হাতে সযত্নে পাতা গুছিয়ে, সুন্দর করে বিছানা পেতে রূপসীকে শুইয়ে দেয় সেখানে।

সারাক্ষণই শান্ত মিষ্টি সুরে কি যেন রূপসীকে বলে চলেছে ওপোকু। মাঝে মাঝে তার হাতে আদরের চাপড়ও মারছে ; অবশ্য এতক্ষণে কঠিন হয়ে গেছে রূপসীর হাত-পা। যথাসম্ভব আরামে রূপসীকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে ওপোকু। জনতা কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। কে জানে, সত্যি খুন করতেই বোধ হয় বেরিয়ে এসেছে 'পাগলা শিকারীটা'। ভয় পেয়ে ওরা এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

ওপোকু কিন্তু ভয় দেখাবার কোন চেষ্টা করে না। চেঁচিয়ে নিজের বাপকে ডাকে শুধু।

বুড়ো এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে :

'এ তুই কি করলি ব্যাটা ?'

'আমি মহাপাপ করেছি বাবা, রক্তের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছি,' জবাব করে ওপোকু।

জনতার ভিতর থেকে এক ভয়াবহ চীৎকার ওঠে। ক্রোধ নয়, আতঙ্কের আর্তনাদ।

আবার যখন সবাই চুপ করে, ফের কথা বলে ওপোকু :

'বাবা, আমি পাপ স্বীকার করছি। প্রায়শ্চিত্তও করছি আমি। পুরোপুরি শাস্তি গ্রহণ করেছি। আরও যদি কিছু বাকী থাকে, তাও করব।'

কথা বলতে বলতেই কাঁধের তূণ থেকে একটা তীর বার করে নিয়ে সজোরে সেটা নিজের উরুতে বিঁধিয়ে দেয় ওপোকু। তারপর তীরের ডাঁটিটাকে চেপে দিয়ে মাথার কাছ থেকে ভেঙে দেয়, পাছে ঝোপের ভিতর ফিরে যাবার সময় গাছের ডালে আটকে খসে যায় তীরটা

আমালাগানের পাশে এসে বসে পড়ে ওপোকু। বাইরের জনতা শুনতে পায়, গোষ্ঠীর প্রথামত সাহসভরে গুণে চলেছে সে : 'এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ, পাঁচ-এক … ?

একটা মাত্র পাতা ছেঁড়া হয়েছে ওপোকুর, বুকটা যেন হঠাৎ কে চেপে ধরেছে মনে হল। টন্ টন্ করে উঠল কপালটা, কি যেন ভিতর থেকে ফেটে বার হতে চাইছে। মুমূর্ষুর সংগ্রাম নয়, এ যেন আতঙ্কের মুক্তি-প্রয়াস। কি এক শক্তি প্রকাশ চাইছে প্রাণপণে। তারই এ প্রসব-বেদনা।

ততক্ষণে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওপোকু। কিন্তু আমালাগানের বুকের উপর তার বমি ছড়িয়ে পড়েছে না দেখা পর্যন্ত, উপলব্ধি করতে পারে না ঠিক মত। ভাবে, গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে রূপসীর বুকের নোংরাটা মুছে দেবে। কিন্তু চেটে ফেললে ক্ষতি কি ? ঝুঁকে পড়ে আমালাগানের

দেহ চাটতে শুরু করে ওপোকু। চক চক করে চাটে রূপসীর বোজা চোখ দুটো। চেটে চেটে সে দুটো মেলাতে পারবে না কি?

হঠাৎ ওপোকুর সারা দেহে একটা খিঁচুনি ধরে যায়। আমালাগানের সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ওপোকুর রক্তে। তা-ও চেটে দেবে ও। বমির চাইতে এর আস্বাদ ত মধুর।

উঠে বসে ওপোকু। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে রূপসীর দিকে। ঠিক এই অবস্থায় আর কোন দিন কি দেখেছে ওকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিতাবাঘের জলাশয়ে—অনেক অনেক দিন আগে—যে দিন ওপোকুকে আঘাত করেছিল রূপসী। গাছের ছায়ায় ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ে, ওর গায়ে চিতাবাঘের সাদৃশ্যই দেখা গিয়েছিল সেদিন। আজও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

এক পা দিয়ে ওপোকু চেপে ধরে আমালাগানেকে, হিংস্র জানোয়ার তার বাচ্চাকে চান করাবার সময় যেমনটি ধরে। ঠিক বাচ্চারই মত তাকে আদর করে ওপোকু, গায়ে হাতও বুলোয়। হয়ত এমনি করেই বাঁচিয়ে তুলতে পারবে প্রিয়াকে।

রূপসীর দেহটা গড়িয়ে উলটে দিতে হবে। কিন্তু হাত দিয়ে কেন? মাথা ও মুখ দিয়ে করলে কি হয়? দাঁত দিয়ে আমালাগানের গায়ের চামড়া কামড়ে ধরে ওপোকু।

হঠাৎ আগুনের হল্কা এসে গায়ে লাগে। ভয়ে ওপোকু পাগল হয়ে যায়। কোন মতে ভয় দমন করতে পারে না। হাতে পায়ে ভর করে চতুষ্পদের মত ছুটতে থাকে। ঝোপ ঝাড় ভেদ করে এই ভাবেই অনেক দ্রুত চলা যায়।

কিন্তু আমালাগানে যে পড়ে রয়েছে—তার প্রেয়সী রূপসী! তাকে রক্ষা করতেই হবে দাবাগ্নির কবল থেকে। জীবনে কোন কিছুকে কোনদিন ভয় করেনি ওপোকু। আজ আগুনের ভয়াবহ গন্ধ তার ত্রাস সঞ্চার করে।

দাঁত দিয়ে আবার কামড়ে ধরে রূপসীকে, আর দশ আঙুলে চেপে ধরে তার দেহ। আগুনের কবল থেকে টেনে আনতেই হবে তাকে।

সহসা একটা বিকট গর্জন শোনা যায়। ধোঁয়ায়, লেলিহান অগ্নিশিখায়, আর জলন্ত রাঙা আঙ্গারে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ওপোকু তখনও আঁকড়ে আছে রূপসীকে, নখদন্ত দিয়ে টেনে আনার প্রয়াস পাচ্ছে ...

বিরাট মহীরূহটা নুয়ে পড়ে দুলতে থাকে। তারপর টুকরো টুকরো হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, বজ্র-গর্জন করে। উপস্থিত লোকগুলি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটে পালিয়ে যায়।

ইতস্তত ছুটে পালাচ্ছে ওরা, হঠাৎ এক জোড়া সুদর্শন চিতাবাঘ লাফ মেরে ওদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। জলন্ত গাছটার কাছাকাছি কোন ঝোপের মধ্যে শুয়েছিল নিশ্চয়ই ও দুটো।

অনেক পরে লোকগুলো ফিরে এসে সাদা ছাইয়ের গাদার মধ্যে সন্ধান করতে থাকে, ওপোকু ও আমালাগানের এতটুক চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। ব্যর্থকাম হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই ওদের চোখে পড়ে সেই চিতা-দম্পতী। বনের মধ্যে যে জলাশয়ের তীরে আমালাগানে প্রাণত্যাগ করেছে, চিতাবাঘের জলপানের সেই পুকুর পাড়েই খেলা করছে সে দুটো।

চিতাবংশের সুসন্তানের দল-চিতা-দম্পতীকে বিব্রত না করেই সরে আসে। ধীর পদক্ষেপে চলে যায় সর্দার-ভূস্বামীর দরবারে, সব ব্যাপারটা পেশ করবার উদ্দেশ্যে। ওরা নিবেদন করে, মহাপাপী ও পাপীয়সী যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করেছে। পূর্বপুরুষ আর দেবতারা তাই নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছে তাদের।

শেষ